ওয়েলিংটন দুর্গোৎসব কমিটির নিবেদন

অঙ্কুর

শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন

ওয়েলিংটনে দুর্গোৎসবের চতুর্দশ বর্ষে

২০২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

Ankur

A publication by enthusiastic Bengalees in
Wellington, New Zealand
Published in 2020 in the fourteenth year of Durgotsav

Front cover picture:
Akalbodhan (Out of season worship of Durga) by Shree Ramachandra
When preparing for worship, Shree Ramachandra was short of one lotus flower. So, He wanted to offer one of his own eyes to compensate.
Goddess Durga prevented that.

Back cover picture:
The future Shree Rama Temple in Ayodhya
(Model in the imagination of the architect)

Published by:

Wellington Durgotsav Committee
Wellington, New Zealand

Website: https://sites.google.com/site/wellingtondurgotsav/
Email: wellington.durgapuja@gmail.com
'Ankur' is also available at the above website

The editor is interested to get your feedback on Ankur.
Please send your comments and suggestions to:

Dilip Das dilipdas5591@gmail.com

সম্পাদকের কম্পিউটার থেকে

বছর ঘুরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা দুর্গার এখন 'বাপের বাড়ি' আসার কথা। কিন্তু বাপের বাড়ির অবস্থা এবার সুবিধার নয়। প্রতিবছরই বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা জাতীয় কিছু-না-কিছু একটা গোলযোগ থাকে। কিন্তু এ বছর গোলযোগটি মাত্রাছাড়া। করোনাসুরের সংক্রমণে শুধু বাংলা বা ভারতের নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষই দিশাহারা। বাংলায় তথা দেশে মায়ের পূজো কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে, সব জায়গায় আদৌ হবে কিনা, তা পরিস্কার নয়। আর এই বিদেশের মাটিতে, নিউজিল্যান্ডে বর্তমানে যা করোনা-পরিস্থিতি, তার গুরুতর কোন অবনতি না হ'লে, ওয়েলিংটনে পূজো হবে, তবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি হবে অনুপস্থিত। পূজো যে ভাবেই হোক, পূজোবার্ষিকী 'অঙ্কুর' স্বমহিমায় প্রকাশিত হ'ল। মলমাসের গেরোয় এবার পূজোর দিনক্ষণ মহালয়ার (এ বছর হ'ল পয়লা আশ্বিন) একমাসেরও বেশী সময়ের পরে – কার্তিকের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহে। তাই প্রকাশনার প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ হ'ল, তখনই 'অঙ্কুর' আত্মপ্রকাশ করল।

'অঙ্কুর'এর জন্য এই সম্পাদকীয়টি লেখার প্রথম দিকে দু'টি ঘটনাপ্রবাহে গোটা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তার প্রথমটি হ'ল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ-জনিত মহামারী/অতিমারী, যেটি এখনও অতিমাত্রায় সক্রিয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে শুরু হয়ে ভারত তথা বিশ্বে এটির প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অনেক সাধারণ মানুষ এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সমেত কিছু প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিসরের চেনা-অচেনা মানুষ এতে আক্রান্ত হয়েছেন। কেউ কেউ মারাও গেছেন। মায়ের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, "মা, তুমি মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছ। এখন এই করোনাসুরের প্রকোপ থেকে তোমার সন্তানদের, মর্ত্যবাসীদের রক্ষা করো।"

অন্য ঘটনাপ্রবাহটি ছিল অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজা এবং শিলান্যাস-কেন্দ্রিক। রাম জন্মভূমি এবং বাবরি মসজিদ নিয়ে কয়েক শতক ধরে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর, বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল। কয়েকমাস আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার একটা নিস্পত্তি হয়েছে এবং মন্দির ও মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। মন্দিরের ভূমিপূজা এবং শিলান্যাসও সম্পন্ন হয়েছে। এখন অযোধ্যার পুণ্য ভূমিতে মন্দির এবং মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সৌধ দু'টি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হয়ে থাকবে।

এই দু'টি ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন এবারের 'অঙ্কুর'এও ঘটেছে। রামমন্দিরের ভূমিপূজা-শীলান্যাসকে কেন্দ্র করে ভারতে একটা বড় জনগোষ্ঠির মধ্যে ভাবাবেগের জোয়ার এসেছিল। এই প্রেক্ষিতে এবছরের 'অঙ্কুর'এর সামনের প্রচ্ছদটিকে করা হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের চিত্র-সমৃদ্ধ। আজ আমরাও তো সেই অকালবোধনের ধারাই বহন করে চলেছি। আর পিছনের প্রচ্ছদটি শোভিত হয়েছে স্থপতির কল্পনায় এবং পরিকল্পনায় অযোধ্যায় ভবিষ্যৎ রামমন্দিরের চিত্রে। করোনা ভাইরাসকে উপজীব্য বা এর উল্লেখ করে দু'টি কবিতা (অপরিযায়ী মধ্যবিত্ত ও করোনা), একটি গান (বৈরাগীর গান), একটি রম্যরচনা (মাস্ক), দু'টি ইংরাজি প্রবন্ধ (New Zealand's COVID-19 Containment Strategy and Outcomes এবং COVID-19: a view from Wellington Regional Public Health) এবং একটি ছবি (Go away! Corona Go away - ভাগ! করোনা ভাগ!) 'অঙ্কুর'কে বৈচিত্রময় করেছে। ইংরাজি প্রবন্ধ দু'টি সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করে একজন অর্থনীতিবিদের এবং একজন জনস্বাস্থ্য চিকিৎসকের লেখা।

এবারে 'অঙ্কুর'এর অন্য উপস্থাপনাগুলির কথায় আসি। শুরুতেই আছে মা দুর্গার বন্দনা করে একটি স্তোত্র 'মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্ - অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি'। এই স্তোত্রটিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু আবৃত্তি-নাচ-গানের অডিয়ো/ভিডিয়ো তৈরী হয়েছে। এরকম দুটি ভিডিয়োর লিঙ্ক পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে। আর এর পরেই আছে মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত, সাতটি পর্বতশৃঙ্গবেষ্টিত সপ্তশ্রুঙ্গী মন্দির এবং সপ্তশ্রুঙ্গী মাকে দর্শনের সচিত্র ভ্রমণকাহিনী 'চন্দ্রবিন্দুর সন্ধানে সপ্তশ্রুঙ্গী'। অষ্টাদশভূজা সপ্তশ্রুঙ্গী দেবী মা দুর্গারই একটি রূপ।

মনীষীর জীবনীতে এবার একজনই আছেন। তিনি 'নবজাগরণের বিস্মৃতপ্রায় মহামনীষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল'। একটি বড় প্রবন্ধে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বড়িশার 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার'এর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত সচিত্র প্রবন্ধে।

বাংলায় একটা কথা আছে ‘এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।’ ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটতে দেখা গেল ক’মাস আগে। করোনা সংক্রমণে এবং তজ্জনিত বিধি-নিষেধে মানুষ যখন জেরবার, তখন পশ্চিম বাংলায় ধেয়ে এল প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমপান। অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের একটা বিস্তৃর্ণ অঞ্চলকে লণ্ডভণ্ড করে দিল সে। আর তার কবল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করতে যে ত্রাণকার্য শুরু হ’ল তার ‘সুযোগ’ নিয়ে মূলত শাসকশ্রেণির একদল ধান্দাবাজ লোক ‘লুটপাট’ চালাল। যা খবর মিলল তা হ’ল যে ত্রাণের টাকা গিয়ে ঢুকল তাদের এবং তাদের গুষ্টির লোকজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, যদিও তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই বঞ্চিত থেকে গেলেন। শাসকের পক্ষ থেকে সাফাই দেওয়ার একটা দুর্বল প্রচেষ্টা হ’ল যে কম্পিউটারের গোলমালে ভুল হয়ে এটি ঘটেছে। আহা, জনগণ যেন রহস্যটি কোথায় তা ধরতে পারে না! একটি কবিতায় (একটি সৌখিন চিঠি) আমপানের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেখানে দুর্নীতির ব্যাপারটির উল্লেখ নেই।

কবিতার দলে করোনা এবং আমপান সম্পর্কিত কবিতাগুলি ছাড়া আছে ‘ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ’, ‘চাঁদগায় ভূত চতুর্দশী’, ‘একা’, ‘নেক্সট ডেস্টিনেশন’, ‘ফিরে দেখা’, ‘কক্ষপথ’, ‘বৃষ্টিবিষাদ কথকতা’, ‘বলে যেও’ এবং ‘আকাশ মিছিল’। এবার ছোটদের কাছ থেকে কোন লেখা পাইনি। বলা ভাল যে আমরা বড়রা তাদের উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে ওয়েলিংটনের কয়েকজন স্কুল-পড়ুয়া কয়েকটি ছবি, যথা ‘The Lion King’, ‘The Dancing Dolphin’, ‘My Foster Puppies’, ’ঢাকের বোলের তালে তালে, দুর্গাপূজো এলো বলে’, এবং ‘Go away! Corona Go away - ভাগ! করোনা ভাগ!’ এঁকে পাঠিয়েছে। একটি বিদেশী রূপকথার বাংলা অনুবাদ ‘সুখী রাজপুত্র’ ঠাঁই পেয়েছে এবারের প্রকাশনায়। রম্যকাহিনী/রম্যরচনার দলে আছে ‘অফিসের জীপ’, ‘কান ধরে ওঠ-বোস’, ‘আইভি’ এবং ‘Greg Hawkins – My Neighbour’। গ্রেগ নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনজাতির একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ। তাঁর সাথে পরিচয়ের সূত্রে আমি তাঁকে নিয়ে দু’চার কথা লিখেছি। স্মৃতির সরণী বেয়ে ছোটবেলায় ফিরে গিয়ে ইংরাজীতে লেখা ‘Down the Memory Lane’ উপহার দিয়েছেন এক লেখিকা।

কলকাতাবাসিনী দুই মায়ের (যাঁদের মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি ওয়েলিংটনে থাকে) একজন মানভূমের (পুরুলিয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের) কথ্য বাংলায় লেখা একটি কবিতা দিয়ে অঙ্কুরকে সমৃদ্ধ করেছেন। উপরে উল্লিখিত ‘করোনা’ কবিতাটি সেটি। আর এক মা নিজের আঁকা দুর্গা-মুখ এবং ঢাকীর দুটি স্কেচ পাঠিয়েছেন। সে দুটি পিছনের প্রচ্ছদের ভিতরের পাতাকে শোভিত করেছে।

পাঞ্জাবী-বাঙালী মিশ্র ঘরানায় দিল্লীতে বড় হওয়া এক খাদ্যরসিক মানুষ বাংলা এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি জনপ্রিয় খাবারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ‘Foodie’ লেখাটিতে। অন্য এক প্রবাসী বাঙালী লেখকের একটি বিশেষ রাজস্থানী পদ আস্বাদনের ‘জিভে-নয়, চোখে-জল-আসা’র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে ‘লঙ্কাকাণ্ড’এ।

কাছে-দূরের যে সমস্ত আঁকিয়ে-লিখিয়েরা তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে এ বারের ‘অঙ্কুর’কে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহকারী সম্পাদকেরা এবার ছুটি নিয়েছেন। তাই ‘একা কুম্ভ রক্ষা করে...!’ ভবিষ্যতে সম্পাদনায় সাহায্যের ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের কেউ উৎসাহিত হ’লে আমার সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। এবার পূজো যে ভাবেই হোক, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনায় এবং দুর্গোৎসবের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাসহ -

ভবদীয়
দিলীপ কুমার দাস
(সম্পাদক)
যোগাযোগ – dilipdas5591@gmail.com

সূচীপত্র

পূজা নির্ঘন্ট এবং কার্য্যনির্বাহীগণ	ওয়েলিংটন দুর্গোৎসব কমিটি	৪
মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্	আদি শঙ্করাচার্য বা রামকৃষ্ণ কবি বিরচিত	৫
চন্দ্রবিন্দুর সন্ধানে সপ্তশৃঙ্গী	আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়	৮
নবজাগরণের বিস্মৃতপ্রায় মহামনীষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	১৮
ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ	আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়	৪২
মাস্ক	প্রণব কুমার মণ্ডল	৪৩
অপরিযায়ী মধ্যবিত্ত	প্রণব কুমার মণ্ডল	৪৪
চাঁদগাঁয় ভূত চতুর্দশী	অমল স্যানাল	৪৫
একটা সৌখিন চিঠি	অরুণাচল দত্তচৌধুরী	৪৭
একা	আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৮
নেক্সট ডেস্টিনেশন	আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৮
সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার	তাপস কুমার সরকার	৪৯
সুখী রাজপুত্র	দিলীপ কুমার দাস	৫৩
বলে যেও	দেবাশিস মজুমদার	৬০
বৈরাগীর গান	অমল স্যানাল	৬১
Go away! Corona Go away!	Ruheli Chatterji	৬১
Down the Memory Lane	Sucharita Sen	৬২
The Dancing Dolphin	Shriya Dutta	৬৩
Greg Hawkins – My Neighbour	Dilip Kumar Das	৬৪
আইভি	পবিত্র কুমার মানী	৬৭
আকাশ মিছিল	রুমকী মজুমদার	৬৯
ঢাকের বোলের তালে তালে	সন্নীভ পাল	৬৯
লঙ্কাকাণ্ড	গৌতম সরকার	৭০
ফিরে দেখা	পূর্বা চ্যাটার্জী	৭১
করোনা	পারুল মুখার্জী	৭২
কান ধরে ওঠ-বোস	দিলীপ কুমার দাস	৭৩
My Foster Puppies	Maya Shaw	৭৪
কক্ষপথ	প্রসেনজিৎ মজুমদার	৭৫
বৃষ্টিবিষাদ কথকতা	প্রসেনজিৎ মজুমদার	৭৬
The Lion King	Adya Dutta	৭৭
অফিসের জীপ	অলোক চট্টোপাধ্যায়	৭৮
Foodie	Aroop Takyar	৮৩
New Zealand's COVID-19 Containment Strategy and Outcomes	Srikanta Chatterjee	৮৭
COVID-19: A view from Wellington RPH	Margot McLean	৯৫
দুর্গা-মুখ এবং ঢাকীর স্কেচ	চয়নিকা বোস	পিছনের প্রচ্ছদ (ভিতর)

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

শ্রীশ্রীদুর্গা এবং লক্ষ্মীপূজার নির্ঘন্ট, ২০২০

পুরোহিত – শ্রী ভূজঙ্গভূষণ চক্রবর্তী
সহকারী পুরোহিত – শ্রী পল্লবকান্তি শর্মা
পূজামণ্ডপ – টাওয়া ইন্টারমিডিয়েট স্কুল হল, ১ রানুই টেরেস, টাওয়া, ওয়েলিংটন

(নির্ঘন্ট পূজা হওয়া সাপেক্ষে, যা এখনও খানিকটা অনিশ্চিত। তা নির্ভর করছে নিউজিল্যান্ডের করোনা পরিস্থিতির উপর। দুর্গাপূজা হলে তা হবে ৩০, ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর। লক্ষ্মীপুজা রবিবার, ৮ই নভেম্বর। ওয়েলিংটন দুর্গোৎসব কমিটির বয়ান অনুযায়ী এই ব্যাপারগুলি এবং পূজা কিভাবে হবে সে সম্পর্কে দুর্গাপূজার আগে কাছাকাছি সময়ে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং ইমেলের মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হবে।)

ওয়েলিংটন দুর্গোৎসব কমিটির কার্য্যনির্বাহীগণ

সভাপতি	শ্রী রাহুল হোমরায়
সাধারণ সম্পাদক	শ্রী সায়ন পাল
কোষাধ্যক্ষা	শ্রীমতি সংহিতা বোস
পূজা-ব্যবস্থাপিকা	শ্রীমতি মধুমিতা দাস
খাদ্য-ব্যবস্থাপিকা	শ্রীমতি শর্মিতা দত্ত
পূজাবার্ষিকী 'অঙ্কুর'এর সম্পাদক	শ্রী দিলীপ কুমার দাস
সংবাদ এবং সামাজিক মাধ্যম উপদেষ্টা	শ্রী সব্যসাচী ব্যানার্জী
প্রাক্তন সভাপতি	শ্রী পল্লবকান্তি শর্মা

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্[1]
"অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি"

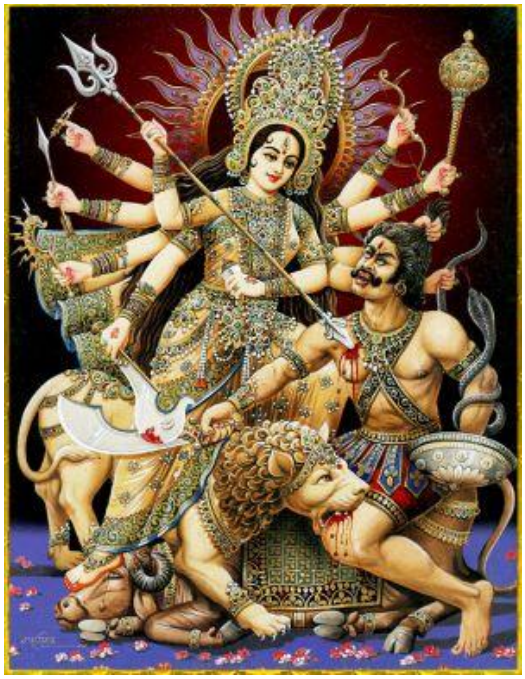

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দিনুতে
গিরিবরবিন্ধ্যশিরোঽধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুনুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১।।

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধরধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবনপোষিণি শঙ্করতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ২।।

অয়ি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরি শিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃঙ্গনিজালয় মধ্যগতে।
মধুমধুরে মধুকৈটভগঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৩।।

অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে।
নিজভূজদণ্ড নিপাতিতখণ্ড বিপাপিতমুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৪।।

[1] স্তোত্রটি কার রচনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একদল মনে করেন এটি শ্রী আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত। অন্যদলের অনুমান তামিল পণ্ডিত শ্রী রামকৃষ্ণ কবি এটির রচয়িতা। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত স্তোত্রটির মধ্যে পাঠান্তরও আছে। ইউটিউবে এই স্তোত্রটি পাঠের এবং নাচের অনেকগুলি ভিডিয়ো আছে। এরকম দু'টি ভিডিয়ো লিঙ্ক হ'ল - https://www.youtube.com/watch?v=Np28O3Y_P2o এবং https://www.youtube.com/watch?v=zu0qhFr0cm8

অয়ি রণদুর্মদ শক্রবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণমহাশিব দূতকৃত প্রমথাধিপতে।
দুরিতদুরীহ দুরাশয়দুর্মতি দানবদুত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৫।।

আয়ি শরণাগত বৈরিবধুবর বীরবরাভয় দায়করে
ত্রিভুবনমস্তক শুলবিরোধি শিরোঽধিকৃতামল শুলকরে।
দুমিদুমিতামর ধুন্দুভিনাদমহোমুখরীকৃত দিঙ্গমকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৬।।

অয়ি নিজহুঙ্কৃতি মাত্রনিরাকৃত ধূম্রবিলোচন ধূম্রশতে
সমরবিশোষিত শোণিতবীজসমুদ্ভব শোণিতবীজলতে।
শিবশিবশুম্ভ নিশুম্ভমহাহব তর্পিতভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৭।।

ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনকপিশঙ্গ পৃষতকনিষঙ্গ রসদ্ভটশৃঙ্গ হতাবটুকে।
কৃতচতুরঙ্গ বলক্ষিতিরঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রট্টদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৮।।

সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি কৃতাভিনয়োদর নৃত্যরতে
কুতু কুকুথঃ কুকুথো গডদাদিকতাল কুতূহল গানরতে।
ধুধুকুট ধুক্কুট ধিংধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ৯।।

জয় জয় জপ্য জয়েজয়শব্দ পরস্তুতি তৎপরবিশ্বনুতে
ঝণঝণঝিঞ্ঝিমি ঝিঙ্কৃত নূপুরশিঞ্জিতমোহিত ভূতপতে।
নটিত নটার্ধ নটী নট নায়ক নটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১০।।

অয়ি সুমনঃসুমনঃসুমনঃ সুমনঃসুমনোহরকান্তিযুতে
শ্রিতরজনী রজনীরজনী রজনীরজনী করবক্ত্রবৃতে।
সুনয়নবিভ্রমর ভ্রমরভ্রমর ভ্রমরভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১১।।

সহিতমহাহব মল্লমতল্লিক মল্লিতরল্লক মল্লরতে
বিরচিতবল্লিক পল্লিকমল্লিক ঝিল্লিকভিল্লিক বর্গবৃতে।
শিতকৃতফুল্ল সমুল্লসিতারুণ তল্লজপল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১২।।

অবিরলগণ্ড গলন্মদমেদুর মত্তমতঙ্গ জরাজপতে
ত্রিভুবনভূষণ ভূতকলানিধি রূপপয়োনিধি রাজসুতে।

অয়ি সুদতী জন লালাসমানস মোহন মন্মথরাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৩।।

কমলদলামল কোমলকান্তি কলাকলিতামল ভাললতে
সকলবিলাস কলানিলয়ক্রম কেলিচলৎকল হংসকুলে।
অলিকুলসঙ্কুল কুবলয়মণ্ডল মৌলিমিলদ্বকুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৪।।

করমুরলীরব বীজিতকূজিত লজ্জিতকোকিল মঞ্জুমতে
মিলিতপুলিন্দ মনোহরগুঞ্জিত রঞ্জিতশৈল নিকুঞ্জগতে।
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদ্গুণসম্ভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৫।।

কটিতটপীত দুকুলবিচিত্র ময়ুখতিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণতসুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুলসন্নখ চন্দ্ররুচে।
জিতকনকাচল মৌলিমদোর্জিত নির্ভরকুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৬।।

বিজিতসহস্রকরৈক সহস্রকরৈক সহস্রকরৈকনুতে
কৃতসুরতারক সঙ্গরতারক সঙ্গরতারক সূনুসুতে।
সুরথসমাধি সমানসমাধি সমাধিসমাধি সুজাতরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৭।।

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং সুশিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেৎ।
তব পদমেব পরম্পদমেবনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৮।।

কনকলসৎকলসিন্ধুজলৈরনুসিঞ্চিনুতে গুণরঙ্গভুবম্
ভবতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভতটীপরিরম্ভসুখানুভবম্।
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাসি শিবম্
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১৯।।

তব বিমলেন্দুকুলং বদনেন্দুমলং সকলং ননু কুলয়তে
কিমু পুরুহূতপুরীন্দুমুখী সুমুখীভিরসৌ বিমুখীক্রিয়তে।
মম তু মতং শিবনামধনে ভবতী কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ২০।।

অয়ি ময়ি দীন দয়ালুতয়া কৃপয়ৈব ত্বয়া ভবিতব্যমুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি যথাসি তথানুমিতাসিরতে।
যদুচিতমত্র ভবত্যুররীকুরুতাদুরুতাপমপাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ২০।।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

চন্দ্রবিন্দুর সন্ধানে সপ্তশ্রুঙ্গী

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়[2]

ভূমিকা

তখন কিছুই ছিল না ...

সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। বস্তুও ছিল না, শক্তিও নয়। এমনকি সময়ও ছিল না। সেই আলফা পয়েন্টে হঠাৎ উদ্ভূত হ'ল এক প্রবল কম্পন - এক মহামহিম কম্পন। কোথা থেকে, কে বলবে? কেউ তো তখন ছিল না। সেই কম্পন শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কী করে, কেউ জানে না, কারণ তখন বস্তু বা শক্তি কিছুই ছিল না। কে শুনলো, তাও কেউ জানে না, কেননা তখন কেউই ছিল না। সেই মহাকম্পনে শক্তি বিস্ফোরিত হল। শুরু হল সৃষ্টির মহাযাত্রা।

বহু বহু কাল পরে সেই মহাকম্পনকে সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পেল এক মহাধ্বনিরূপে। প্রণব ধ্বনি। ওঙ্কার ধ্বনি। অউমমমমমমমম .....

ওঙ্কার আদি ধ্বনি। অ, উ, ম এই তিন পূর্ণমাত্রা আর অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রবিন্দু - এই সাড়ে তিন মাত্রা দিয়ে আমরা ওঙ্কারকে প্রকাশ করি। প্রকাশ? অপ্রকাশ্যকে কে প্রকাশ করবে? এত ক্ষমতা কার?

না, সেই ক্ষমতা কারুরই নেই। তবুও মানুষ ভাষা দিয়ে বুঝতে চেয়েছে, বোঝাতে চেয়েছে প্রণবধ্বনিকে। তাই ঐ সাড়ে তিন মাত্রার কারসাজি।

মুম্বাই-নানডেড তপোবন এক্সপ্রেস দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে বর্ষায় সজল-সবুজ পশ্চিমঘাট পর্বতের বুক চিরে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এত সবুজ যে মনে হয় স্পেকট্রামের অন্য রংগুলি যেন ছুটি নিয়েছে। আর আছে অজস্র ছোট বড় ঝরণা। পাহাড়ের গা বেয়ে নাচতে নাচতে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে উচ্ছল চঞ্চল পায়ে। এরা প্রায় সবাই বর্ষার সঙ্গী, অন্য সময় বেড়াতে যায় অন্য কোথাও।

---

[2] লেখক পরিচিতি – দুর্গাপুর-নিবাসী ডাঃ আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায় পেশায় গাইনিকোলজিস্ট, কিন্তু নেশায় অনেক কিছুই - ভ্রমণপ্রেমী, হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকার, চিত্রগ্রাহক, লেখক, কবি, ব্লগার ও মন্দির-গবেষক। অবসর জীবনে তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান ও দেবস্থান ঘুরে বেড়িয়ে সেগুলি নিয়ে গবেষণামূলক লেখা লেখেন এবং তাঁর এই লেখাগুলি পাঠকমহলে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর লেখা মোট আটটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে একটি উপন্যাস অফিসিয়ালি বেস্ট সেলার। তাঁর লেখা দুটি হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকিংয়ের বইও অত্যন্ত জনপ্রিয়। চারটি কুম্ভ মেলা নিয়ে লেখা তাঁর একটি বইও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ওয়েলিংটন থেকে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী 'অঙ্কুর' এবং নববার্ষিকী 'বৈশাখী'কে তাদের জন্মলগ্ন থেকেই প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী এবং কবিতা দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করে আসছেন।

জানালা দিয়ে বাইরে সবুজের বন্যার দিকে তাকিয়ে ওঙ্কারের কথা ভাবছিলাম। ওঙ্কারতত্ত্ব মহাতত্ত্ব, আমার গবেট মাথায় তার কণামাত্রের বেশি ঢোকে না। এমনকি অ্যভারেজ ম্যাঙ্গো পিপুল বাঙালির মত ওঙ্কারের সঠিক উচ্চারণটাও স্পনটেনিয়াসলি আমার মুখে আসে না - বলি 'ওং'। কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণটা একটু আলাদা -- অনেকটা 'অ-উ-মমমম'-য়ের মত। এই অউম শব্দকে ভাঙলে আসে 'অ', 'উ' আর 'ম'। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। 'অ' বর্ণমালার প্রথম অক্ষর, আর 'ম' শেষ পূর্ণবর্ণ। তাই 'অউম' শুরু থেকে শেষ, আলফা থেকে ওমেগা। কিন্তু ওঙ্কারের লিখিত রূপে অ, উ, ম ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে, তা হল চন্দ্রবিন্দু, যাকে বলে অর্দ্ধমাত্রা।

তা ট্রেনে বসে এইসব গুরুগম্ভীর ভাবনা কেন? উত্তরটা হল, মহারাষ্ট্রের চারটি শক্তিমন্দিরের শক্তিকে এই ওঙ্কারের প্রকাশ বলে মনে করা হয়। সেগুলি হল কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী, তুলজার ভবানী, মাহুরের রেণুকামাতা আর বানী-নান্দুরির সপ্তশ্রুঙ্গী।

এর মধ্যে কোনটি কী, বিশেষ করে কোনটি অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, যদিও সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে সপ্তশ্রুঙ্গী হচ্ছেন অর্দ্ধমাত্রা বা চন্দ্রবিন্দুর প্রকাশ। আজ (১২ সেপটেম্বর ২০১৮) চলেছি সেই চন্দ্রবিন্দুর খোঁজে। আমার শক্তিপীঠ সন্ধানের নবতম যাত্রায়।

সপ্তশ্রুঙ্গী

সপ্তশ্রুঙ্গী কথাটির অর্থ হল সপ্ত শৃঙ্গ পরিবেষ্টিত বা সপ্ত শৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাধারণ ভাবে সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীকে অর্দ্ধ পীঠ বলা হলেও 'দেবী মাহাত্ম্য' অনুসারে সপ্তশ্রুঙ্গী হলেন কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী, তুলজার মহাসরস্বতী ও মাহুরের মহাকালীর মিলিত রূপ। এ ব্যাপারে আমরা পরে আসবো।

একটু ভূগোল ও ভূতত্ত্বের পড়াশুনো

মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার কালবান তালুকের নান্দুরি গ্রামের কাছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের গায়ে প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চতায় সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর মন্দির। নাসিক থেকে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। বলা হয় মন্দিরটি সাতটি পর্বতশৃঙ্গের মাঝে অবস্থিত, তাই ঐ নাম। সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতের সহ্যাদ্রী বা অজন্তা-সাতমালা রেঞ্জের একটি অংশ। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ৪৬০০ ফিট। এই পর্বতশ্রেণী ভৌগোলিক ভাবে Deccan trap-য়ের অন্তর্ভুক্ত। Deccan trap ভারতের দাক্ষিণাত্যের প্রায় পুরোটা নিয়েই গঠিত একটি আগ্নেয়শিলা অঞ্চল। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে প্রায় তিরিশ হাজার বছর ধরে চলা এক মহা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের গলিত লাভাস্রোত জমে গিয়ে সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ ব্যাসাল্ট পাথরের এই পার্বত্যভূমি। ব্যাসাল্ট ছাড়াও এখানকার পাহাড়ে আছে লাল ল্যাটেরাইট।

এই ব্যাসাল্ট পাথরের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে এতে লম্বা লম্বা জোড় (columnar joint) থাকে, যা একে ভঙ্গুর করে তোলে। এর ফলে এই ধরণের পাথরযুক্ত পাহাড়ে ধস নামার প্রবণতা থাকে। এই কারণেই সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতে ধস নামার সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়াও পাহাড়ি রাস্তায় তীব্র বাঁক আছে বলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেশি। মন্দিরে যেতে হলে প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তা পাহাড় চড়তে হয়।

সপ্তশ্রুঙ্গীর পথে

তপোবন এক্সপ্রেস প্রায় আধঘণ্টা লেট করে নাসিক রোড স্টেশনে ঢুকলো সকাল ১০:২০-তে। নাসিক রোড আমার অচেনা নয়, আগে তিন বা চারবার এসেছি। আগে প্রত্যেক বারেই এসেছি ত্র্যম্বকেশ্বর দেখতে। শেষবারের মত এসেছি ২০১৫-তে সিংহস্থ কুম্ভমেলার সময়। সে গল্প আমার কুম্ভমেলা নিয়ে লেখা বইটিতে শুনিয়েছি। এবার ত্র্যম্বকেশ্বরের দিকে যাবো না। বাবাকে তিনবার দর্শন করেছি, এবার লক্ষ্য মা। তাই ত্র্যম্বকেশ্বর বাদ।

স্টেশনের বাইরে বেরোতেই অটোওলারা ধরলো। আমি প্রথমেই বলে দিলাম অটো নয়, আমার গাড়ি চাই, সপ্তশ্রুঙ্গী যাবো, আর ফেরার পথে গোণ্ডেশ্বর শিবমন্দির দেখতে সিন্নর হয়ে ফিরবো। আমার প্ল্যান শুনে অটোওলারাই ট্যাক্সিওলাদের ডেকে দিল। তিনচারজন ট্যাক্সিওলা আমার দিকে এগোতেই আমি আমার প্ল্যানটা বললাম। জানি যে সপ্তশ্রুঙ্গী আর সিন্নর দু'টো জায়গা দু'দিকে, ফলে রাস্তা বেশি হবে। সপ্তশ্রুঙ্গী ৬০ কিলোমিটার, মানে যাতায়াতে ১২০, আর সিন্নর ঘুরে এলে এটা সম্ভবতঃ ১৬০ কিলোমিটারের বেশি হয়ে যাবে। যাই হোক, একটা ট্যাক্সির সঙ্গে দরদাম করে পোষালো। ট্যাক্সিতে উঠলাম।

আমার যা অভ্যেস, গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারের মোবাইল নম্বর জেনে নিই, এতে অনেক সুবিধে হয়। ড্রাইভার সাহেবের নাম জানা গেল রফিক। এখানে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। আমার এই দু'টি মন্দির পরিক্রমায় রফিকভাই আমাকে পুরো গাইডের মত করে এই দু'টি মন্দির সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছে। বিশেষ করে সপ্তশ্রুঙ্গী দেবী সম্বন্ধে রফিকের কাছ থেকে কিছু জিনিষ জানলাম যা নেটে পাই নি। এইই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ!

নাসিক রোড স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে নাসিক শহর ছাড়িয়ে এলাম। এবার আমরা চলেছি SH 17 অর্থাৎ স্টেট হাইওয়ে ১৭ ধরে। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি আর ট্রাক চলছে। একটা জিনিষ খেয়াল করলাম, রাস্তার অবস্থা কিন্তু খুব একটা সুবিধার নয়। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ছোটখাটো রাস্তাও এখন অনেক ভালো।

রাস্তার দুপাশে পড়ছে অজস্র ভাইনইয়ার্ড বা আঙুরক্ষেত। নাসিক হচ্ছে ভারতের আঙুর এবং ওয়াইন ক্যাপিটাল। এখানকার সুলা ওয়াইন এবং সুলা ফেস্টিভ্যাল বিশ্ববিখ্যাত। এইসব আঙুরক্ষেত থেকেই আঙুর যায় ওয়াইন তৈরীর কারখানায়। সুলা ওয়াইন কোম্পানি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুলা কোম্পানি বিভিন্ন উন্নত মানের আঙুর যেমন Chenin blanc, Sauvignon blanc, Riesling এবং Zinfandel ভারতে নিয়ে আসে। উন্নত মানের ওয়াইন তৈরী করে এই কোম্পানি বর্তমানে ভারতের ওয়াইন ব্যবসার প্রায় ৭০% দখল করেছে। ওয়াইন ছাড়াও সুলা কোম্পানি আঙুর বীজের তেল (গ্রেপ সীড অয়েল) ও গ্রেপ ব্র্যাণ্ডি তৈরী করে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নাসিকে সুলা ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। নাচগানের সঙ্গে খানা এবং পিনাতে তিনদিনের এই উৎসবে দেশ-বিদেশের বহু আর্টিস্ট এবং পর্যটক অংশগ্রহণ করেন।

যাই হোক, এখন সব শুনশান। আঙুর ক্ষেতও ফাঁকা। আঙুরক্ষেত দেখতে দেখতে আমরা চলেছি। তালেগাঁও পেরিয়ে গেলাম। পথে দুটি গ্রাম্য মন্দির চোখে পড়ল। দুটিতেই লেখা আছে "সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা কি মন্দির"। বোঝা গেল এ হচ্ছে সপ্তশ্রুঙ্গী মায়ের রাজ্য। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটি ছোট শহর পার হলাম, নাম ডিনডোরি। বাজার, ব্যাঙ্ক, স্কুল, বাসস্ট্যান্ড, ভিড় সব মিলিয়ে একটি স্ট্যাণ্ডার্ড মফস্বল শহর।

এরপরেই আমরা পার হলাম মেজ না হলেও সেজ সাইজের একটি নদী, নাম কাদবা বা কাদয়া (Kadwa)। ৭৪ কিলোমিটার লম্বা এই নদীটি ডিনডোরির কাছে সাতপুরা পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে গোদাবরী নদীতে মিশেছে। সঙ্গমের কাছে একটি ড্যাম ও রিজার্ভার আছে। ঐ রিজার্ভারের নাম নান্দুর মধ্যমহেশ্বর রিজার্ভার এবং এটি একটি নাম করা পক্ষীরালয়। শীতকালে ওখানে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে।

আরও কিছুটা গিয়ে বামদিকে চোখে পড়লো দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলের এক বিশাল লেক। রফিক ভাই জানালো এটি ওঝারখেড় ড্যামের জলাধার। উনন্দা নদীর উপর ড্যাম তৈরী করায় তৈরী হয়েছে এই লেকটি। এখানে গাড়ি থামিয়ে একটু নামলাম। খুব সুন্দর জায়গাটি। চারদিকে সবুজের মেলা। সামনে ড্যামের নীল জল। লেকের মাঝে একটি সবুজ দ্বীপ, যদিও সেখানে কোনও রাজা আছেন কিনা জানা গেল না। আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। ভারী সুন্দর। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরও থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সময়

নেই। আমার লম্বা প্রোগ্রাম। তাই কয়েকটি ফটো তুলে আবার গাড়িতে বসা গেল। এখান থেকে বানী আরও ৫ কিলোমিটার।

কিছুক্ষণ থেকেই চোখে পড়ছিল দূর দিগন্তে একসারি নীলচে পাহাড়। সহ্যাদ্রী পর্বতশ্রেণী। ক্রমশঃ আমরা সেই পাহাড়ের দিকে চলেছি। হঠাৎ একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে রফিকভাই বললো, "বহি হ্যয় সপ্তশ্রুঙ্গী।" তাকিয়ে দেখি দূরে একসারি পাহাড়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিচিত্র দর্শন পাহাড়। মাথাটা অনেকটা বহুচূড়াযুক্ত মুকুটের মত। সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত। সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর বাসস্থান।

দূর থেকে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই সেই সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত! এখানেই বাস করেন সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা ... বা সপ্তশ্রুঙ্গীনিবাসিনী দেবী ... অথবা ব্রহ্মস্বরূপিনী দেবী। এখানে একটা খটকা লাগে। সপ্তশ্রুঙ্গী দেবী বা মাতা অথবা সপ্তশ্রুঙ্গী-নিবাসিনী দেবী তো বোঝা গেল, কিন্তু ব্রহ্ম এলেন কোথা থেকে? না, কারণ আছে। কথিত আছে যে ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে দেবী আবির্ভূতা হন, তাই তিনি ব্রহ্মস্বরূপিনী। নাম যাই হোক না কেন, নিবাস তো ঐ পর্বতে। ওখানে পৌঁছতে আর বেশি সময় নেই।

আবার গাড়ি চলছে। ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে গেল, তার মধ্যে কিষণগাঁওয়ের নামটা পড়তে পারলাম। তার পরে এলো বানী। ছোট শহর। সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতশ্রেণী এবার মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে। বানীর ভিড় ঠেলে কিছুটা এগোতেই একটি মোড়, যাকে মহারাষ্ট্রে বলে 'চৌক'। এই চৌকগুলোর সেন্টারে সাধারণতঃ একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে কোনও নেতা বা বিখ্যাত মানুষের মূর্তি থাকে, তবে মূর্তিবিহীন স্থাপত্যও দেখা যায়। বানীর এই চৌকে একটি বিশাল ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের আকৃতির স্থাপত্য, মাথায় ন'টি বৈদ্যুতিক আলো লাগানো। সুন্দর দেখতে।

ভালো কথা, এরকম তো অনেকই আছে। কিন্তু বানী শহরের এই চৌকটিতে যে জিনিষটি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তা হল এর নাম। বড় বড় করে লেখা আছে "ক্রান্তিসূর্য বিরসা মুণ্ডা চৌক"। বিরসা মুণ্ডা! আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিরসা মুণ্ডা, সেই সুদূর ঝাড়খণ্ডের অসাধারণ উপজাতীয় নেতা বিরসা মুণ্ডার নামে চৌক এখানে এই মহারাষ্ট্রের এই অখ্যাত জায়গায়!

সামনে পাহাড়

বিরসা চৌক থেকে আমরা ডানদিকে টার্ন নিলাম। এই রাস্তা দিয়ে ২২ কিলোমিটার যেতে হবে। তার মধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা বা ঘাট সেকশন। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দল সামনে ছড়িয়ে আছে। এই পাহাড় পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর অংশ, যা হিমালয়ের চেয়েও প্রাচীন। বৃদ্ধ পর্বতের চিহ্ন চ্যাপটা মাথা, অর্থাৎ table-top মাথা। তারুণ্যের চিহ্ন উন্নত শির, তাই তরুণ পর্বতগুলির শৃঙ্গগুলি উত্তুঙ্গ ছুঁচলো। পশ্চিমঘাট বুড়োর দলে পড়ে, তাই এর বেশিরভাগটাই চ্যাপটা মাথা, যদিও ছুঁচলো শৃঙ্গও আছে।

প্রধানতঃ গ্র্যানাইট, নিইস (Gneiss), ব্যাসাল্ট, ল্যাটেরাইট ও লাইমস্টোনে তৈরী পশ্চিমঘাটের জন্ম সুপ্রাচীন সুপার-কন্টিনেন্ট গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে ভারত তৈরী হওয়ার সময় প্রায় ১৫ কোটি বছর আগে, যদিও এটি বর্তমান রূপটি পায় Cenozoic পিরিয়ডে (সাড়ে ছ'কোটি বছরেরও আগে)। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা Deccan Plateau-র পশ্চিম সীমা দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৬০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এর শুরু গুজরাটের সোনাগড়ে। সেখান থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারীর কাছে মারুনথুভাজমালাই পাহাড়ে এর শেষ। চওড়ায় পশ্চিমঘাট ১০০ কিলোমিটার। পশ্চিম দিকে আরব সাগর আর পশ্চিম ঘাটের মধ্যে আছে একটি সরু লম্বা সমতলভূমি, যার নাম কোঙ্কন। পশ্চিমঘাটের আকৃতির জন্য অনেক সময় একে Great Escarpment of India বলা হয়। Escarpment হল সরু লম্বা পাহাড় যার একদিক খাড়া ও অন্যদিক ঢালু।

পশ্চিমঘাট পর্বত ও তার সন্নিহিত অঞ্চল পৃথিবীর দশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Biodiversity hotspot-য়ের অন্যতম। এখানে প্রায় ৭৫০০ প্রজাতির সপুষ্প উদ্ভিদ, ১৮০০ প্রজাতির অপুষ্প উদ্ভিদ, ১৩৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৫০৮ প্রজাতির পাখি, ১৭৯ প্রজাতির উভচর, ৬০০০ প্রজাতির পতঙ্গ এবং ২৯০ প্রজাতির মিষ্টি জলের মাছ দেখা যায়। তারচেয়েও বড় কথা, বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন পশ্চিম ঘাটের গভীর জঙ্গলে এখন পর্যন্ত অজানা আরও অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণী থাকার সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা একটি UNESCO স্বীকৃত World Heritage Site; মোট ৩৯টি ওয়ার্লড হেরিটেজ সাইট আছে পশ্চিমঘাটে। কেরলে ২০টি, কর্ণাটকে ১০টি, তামিলনাড়ুতে ৫টি এবং মহারাষ্ট্রে ৪ টি। কেরলের আনামুড়ি পীক (৮৮৪২ ফিট) হল পশ্চিমঘাটের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ।

বুঝলাম, দেবী সপ্তশ্রুঙ্গী থাকার জন্য খুবই ভালো জায়গা বেছে নিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হিমালয়ের উচ্চতা না থাকলেও পশ্চিমঘাটের ঐতিহ্য অনেক বেশি। আজ পশ্চিমঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে এই অতিবৃদ্ধ পর্বতকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।

চলো যাই সপ্তশ্রুঙ্গী মায়ের দরবারে

আমরা বানী ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতের দিকে। রাস্তাটি এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। একটা জিনিষ খেয়াল হল -- বানী আসার আগে অবধি রাস্তার অবস্থা ভালো না হলেও বানীর পর থেকে রাস্তা খুবই ভালো। দু'পাশে সবুজ গাছপালা ও কয়েকটি গ্রাম। কয়েকটি গ্রামের নাম পড়তে পারলাম -- চণ্ডিকাপুর, চামদারী ইত্যাদি। সামনের পাহাড় কখনো ডানদিকে কখনো বাঁদিকে পড়ছে, আবার কখনো বা সোজা সামনে। পাহাড়ের মাথাগুলি বেশিরভাগই চ্যাপটা বা গোল, যা পশ্চিম ঘাটের বিশেষত্ব। তারই মধ্যে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতের একাধিক ছুঁচলো শৃঙ্গযুক্ত মুকুটের মত মাথাটা, দেখে মনে হচ্ছে মা সপ্তশ্রুঙ্গী মাথায় মুকুট পরে আছেন।

এরপরে এল নান্দুরি গ্রাম। এই নান্দুরিই হচ্ছে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত বা মন্দিরে যাওয়ার প্রধান বেসক্যাম্প। এখান থেকেই সপ্তশ্রুঙ্গী যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি গেছে। এমনকি যারা হেঁটে যান বা হেঁটে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত প্রদক্ষিণ করেন, তারা সাধারণতঃ নান্দুরি থেকেই যাত্রা শুরু করেন। নান্দুরি গ্রাম হলেও বেশ বড়, আর দেখে মনে হল বেশ উন্নত। অনেকটা আমাদের ওদিককার মফস্বল শহরের মত। সপ্তশ্রুঙ্গীতে প্রচুর তীর্থযাত্রী আসেন, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে গুজরাটের লোকেরা বেশ পয়সাওলা। এইসব তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য নান্দুরি স্বাভাবিক ভাবেই বড় ও উন্নত হয়ে গেছে।

আমরা নান্দুরে না থেমে এগিয়ে চলেছি। কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি থামাতে হল -- টোল ট্যাক্স দিতে হবে। বেশি নয়, যাত্রী পিছু ২০ টাকা মাত্র। দিলাম। এবার শুরু হল ঘাট সেকশন। রফিকভাই বললেন এই ঘাট সেকশন প্রায় ১০ কিলোমিটার। শুনেছি এবং পড়েছি রাস্তার এই অংশটি দুর্ঘটনা-প্রবণ। খুব বাঁক আছে। তাছাড়া এই পাহাড়ে মাঝে মাঝেই ধস নামে (কারণটা আগেই বলা হয়েছে)। অবশ্য সেসব নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আছি তো জীবনের একস্টেনশন পিরিয়ডে, এখন শেষ হলেই ভালো, আরও ভালো এইরকম সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে তীর্থস্থানের বদলে নিজের পার্মানেন্ট ঠিকানায় পৌঁছতে পারলে। সে সৌভাগ্য কি আর কপালে আছে?

যাই হোক, ওসব চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না। তার চেয়ে চারদিকের প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে নজর দেওয়াই ভালো। আর নজর কাড়ার মত সৌন্দর্যই বটে। একে তো কত আকার ও আকৃতির পাহাড়, তার উপর বর্ষার জল পেয়ে পাহাড়ের গায়ে কতই না গাছপালা, লতাপাতা গজিয়ে পাহাড়কে সবুজ পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছে। কত রকম রঙের ফুল ফুটে আছে! এক জায়গায় চোখে পড়ল খুব সুন্দর একটি ছোট পাহাড়ি ঝরণা, পাহাড়ের গা বেয়ে নাচতে নাচতে নীচে নামছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি-মা সন্তানের অভ্যর্থনায় সেজেগুজে

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো, স্বর্গগত বাবার কথাও। মনে মনে দু'জনকে প্রণাম জানিয়ে বললাম, 'তোমাদের আশীর্বাদেই এসব কিছু দেখতে পাচ্ছি। প্রণাম নিও।'

বাঁদিকে চোখে পড়ছে একটি গোলমাথা পাহাড়ের কোলে একটি বিশাল জলাশয়। দেখে মনে হল বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য বানানো ড্যাম। আমাদের গাড়ি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। মাঝে মাঝেই হেয়ার পিন বেণ্ড। কোথাও কোথাও খুব খাড়াই রাস্তা, গাড়ি সেকেণ্ড গিয়ারে টানতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে অনেক নীচে চোখে পড়ছে নান্দুর গ্রামের বাড়িঘর। আমাদের হাইটের জন্য ওগুলো দেখাচ্ছে যেন বিন্দুবৎ। মনে হচ্ছে ATR প্লেনে চড়েছি।

সপ্তশৃঙ্গী পর্বত

সপ্তশৃঙ্গীর পথে

এক জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে পাহাড়ের মাথায় আর্চের মত একটি তোরণ। অনেক দূরে, ভালো বোঝা যাচ্ছে না। কোনও পুরোনো দুর্গ নাকি? মহারাষ্ট্রের আনাচে কানাচে তো দুর্গ আর দুর্গ। রফিকভাইকে জিজ্ঞেস করতেই উনি জানালেন যে ওটা দুর্গ নয়। মহিষাসুরকে বধ করার সময় দেবী সপ্তশৃঙ্গীর ছোঁড়া তিরের আঘাতে পাহাড় ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেই ফুটোটাই ঐ আর্চের মত জিনিষটা।

ফুটো! এ তো ফুটোর প্রপ্রপ্রপিতামহ বললেও কম বলা হবে! একটি তিরের আঘাতে যদি পর্বতভেদী ঐ বিশাল ফুটোটি হতে পারে, তবে তিরটির আকার কত বড় ছিল? নাকি রাইফেলের হার্ড নোজ বুলেটের মত স্পিন ফ্যাক্টর ছিল? মোমেন্টামই বা কত ছিল? একটা কথা মনে হল, আমাদের শাস্ত্র আর মহাকাব্যের অস্ত্রগুলিকে কল্পনা হিসেবে উড়িয়ে না দিয়ে যদি অস্ত্র-বিশেষজ্ঞরা ওগুলো নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করতেন, তা হলে বোধহয় ভালোই হত।

এই সপ্তশৃঙ্গী মাতার মন্দিরে বহু ভক্ত পায়ে হেঁটে ওঠেন এবং পর্বতটিকে প্রদক্ষিণ করেন। হিন্দুরা ক্লক ওয়াইজ দেবতাকে প্রদক্ষিণ করেন। কিন্তু যেহেতু সপ্তশৃঙ্গী মন্দির এবং সপ্তশৃঙ্গী মাতার মূর্তি পাহাড়ের গায়ে লাগানো, সেহেতু দেবীমূর্তি বা মন্দির প্রদক্ষিণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য যারা প্রদক্ষিণ করতে চান, তারা পুরো পর্বতটিকেই প্রদক্ষিণ করেন। এর জন্য সপ্তশৃঙ্গী পর্বতকে ঘিরে একটি পায়ে চলার মত পরিক্রমাপথ আছে। এই পথটি ৪০৪০ ফিট থেকে ৪৪৩০ ফিট উচ্চতায় এবং যথেষ্ট দুর্গম। তবুও ভক্তরা এই রাস্তায় চলতে পিছিয়ে যান না। কয়েকজন এই রকম পরিক্রমাকারীদের চোখে পড়লো।

এই পাহাড়ে অনেক রকম ওষধি গাছ পাওয়া যায়। এমনকি গল্প আছে যে রামায়ণের যুদ্ধের সময় লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলের আঘাতে মৃতপ্রায়, তখন বিশল্যকরণীর খোঁজে হনুমান এখানে এসেছিলেন।

অবশেষে এক জায়গায় এসে চোখে পড়লো একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'ধন্যবাদ, ঘাট সেকশন শেষ'। বাহ্। এবার তাহলে সত্যি সত্যিই মায়ের দরবারের কাছে এসে পড়েছি। বাঁদিকে চোখে পড়ছে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতের বিচিত্র মুকুটের মত মাথাটা। মাকে নাকি সাতটি পর্বতশৃঙ্গ ঘিরে থাকে, যদিও এখান থেকে ঠিক সাতটি পীক দেখা যাচ্ছে না। এখানে সত্যিই রাস্তাটা মোটামুটি সমতল দিয়েই গিয়েছে, অর্থাৎ ফ্ল্যাট-টপ পাহাড়ের উপর দিয়ে। একে টেবলল্যাণ্ডও বলে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মাঠ। সেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে দেখলাম অজস্র পিঙ্ক রঙের ফুল ফুটে ফুলের কার্পেট বানিয়ে রেখেছে। কী যে সুন্দর, লিখে বোঝানো যাবে না।

আর একটু এগোতেই চোখে পড়লো খুব বড় একটি বাস স্ট্যাণ্ড। এখন ফাঁকা, মাত্র একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে একটি ফেস্টুন টানানো, তাতে লেখা আছে 'পদযাত্রা, সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা কি দরবার'। তার নীচে গুজরাটের একটি শহরের নাম লেখা। পদযাত্রায় বাসের কী রোল মাথায় ঢুকলো না, তাই রফিকভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। মুসলমান হলেও রফিকভাই এখানকার রীতি নীতি সব জানেন। উনি জানালেন, এ হল আধুনিক পদযাত্রা। ভক্তরা অবশ্যই পায়ে হেঁটে আসছেন, কিন্তু সাপোর্ট স্টাফ অর্থাৎ শেফ ও তার হেলপিং হ্যান্ডরা জল আর রসদ প্লাস বাসন-টাসন গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে বাসে আসছে।

বাহ্! চমৎকার ব্যবস্থা। পূণ্যের এমন সুন্দর 'মেড ইজি' ব্যবস্থা দেখে যুগপৎ আনন্দিত এবং শিহরিত হলাম। মানতেই হবে গুজরাটের লোকেরা ইনোভেটিভ। শুধু একটা কথা মাথায় ঢুকলো না - ঐ বাসযাত্রী সাপোর্ট স্টাফদের পূণ্য হবে কিনা, বা হলে পদযাত্রীদের পূণ্যের কত পারসেন্ট হবে। তবে ওটা আমার প্রবলেম নয়। আর একটু এগোতেই একদল পদযাত্রীর দেখা পেলাম। রফিকভাই জানালেন এরা গুজরাট থেকে ১০০-১৫০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসছে, তবে ঐ বাসটা এদের কিনা বলতে পারলেন না।

এবার চোখে পড়ল বেশ কিছু দোকান, যথারীতি পূজোর সামগ্রী সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। আর যা চোখে পড়ল তা হল দোকানের চেয়েও সংখ্যায় বেশি গাড়ি রাখার জায়গা। বোঝা গেল এখানে প্রচুর গাড়িওলা লোকজন আসেন। আমাদের গাড়ি দেখে অনেক দোকানদার বা তাদের টাউটরা দৌড়ে এলো। কারোর হাতে পূজার সামগ্রী, কারো বা খালিহাত। সবাই ডাকছে, কিন্তু রফিকভাই কাউকে পাত্তা না দিয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা দাঁড় করালেন "জয় অম্বেমাতা কার স্ট্যাণ্ড"-য়ে। তারপর গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বললেন, "ইয় মেরা জানপেহচানবালে দুকান হ্যয়। আপ হিঁয়াসে সামান লিজিয়ে, গাটি রাখনা মুফৎ হোগা।" অহো! কী চমৎকার ব্যবস্থা! এই সিমবায়োটিক ব্যবস্থা দর্শনে আর একবার যুগপৎ পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হলাম।

কিন্তু এখন কী করবো? আমি এদের এড়িয়ে মন্দিরে চলে যেতেই পারি, কিন্তু বৃদ্ধ দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম। এখন সিজন নয়। একেবারেই ফাঁকা। হয়ত সকাল থেকে কোন খদ্দেরই জোটে নি। আমি এসেছি প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূর থেকে ভালোই টাকা খরচ করে। এখানে সামান্য কিছু টাকা বাঁচিয়ে আমার কী হবে? অথচ, আমি পূজার সামগ্রী কিনলে ঐ গরীব মানুষটির উপকার হবে। ঠিক আছে, কেনাই যাক। আমি জানি যে এখানে সপ্তশ্রুঙ্গী মাতাকে শাড়ি-চোলি (ব্লাউজ) 'চড়াতে' হয়। এটা এখানকার কাস্টম। আমি অপশনের দিকে তাকালাম। চমৎকার টায়ার সিস্টেম। তিন দামের পূজা-সামগ্রী উপস্থিত - ২৫০/-, ৩৫০/- ও ৫৫০/-। বলাই বাহুল্য, যত দাম শাড়ি ইত্যাদির চিকনাই তত বেশি। শাড়ির সঙ্গে একটি নারকেল, এক প্যাকেট নকুলদানা ও কয়েকটি শুকনো খেজুর কমন। বুঝলাম, শাড়িই হচ্ছে ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর। আমার ঐ ২৫০/--য়েই চোখ, কিন্তু এদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝলাম গাড়িওলাদের জন্য বরাদ্দ হায়ার ক্যাটেগরি প্রোডাক্ট, তা সে গাড়িটি ভাড়া গাড়ি হলেও। কী আর করা যায়, কমপ্রোমাইজ করে সাড়ে তিনশতকী মনসবদার বনা গেল। আফটার অল, গাড়িটা তো ভাড়া করা। এবার কি মন্দিরে যাওয়া যেতে পারে?

নিশ্চয়ই। দোকানদার এবং রফিকভাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দু'জনে মিলে ডাকাডাকি করে একটি মাঝবয়সী লোককে হাজির করলেন। এ আমাকে রোপওয়ে অবধি পৌঁছে দেবে। মানে এরা ধরেই নিয়েছে আমি সিড়ি দিয়ে না উঠে রোপওয়ে দিয়ে মন্দিরে যাবো। অবশ্য আমার নিজেরও ইচ্ছে রোপওয়ে দিয়ে ওঠার। না, সিড়ি দিয়ে উঠতে আমার কোনও শারীরিক অসুবিধা নেই। এখানে তো মাত্র ৫০১টি সিড়ি, এতে আমার কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি রোপওয়েতে আগ্রহী অন্য কারণে। এখানকার রোপওয়েটি সাধারণ রোপওয়ে নয়, ভারতের প্রথম Funicular ropeway বা Funicular car system. ইঞ্জিনিয়ারিং কচকচি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে স্ল্যান্টিং ভাবে দড়ির সাহায্যে ওঠা এক বা একাধিক কামরার গাড়িকে Funicular Car/Ropeway বলা হয়। বিদেশে বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডে যারা বেড়াতে গেছেন, তারাই এই ধরণের Funicular ropeway-তে চড়েছেন। ভারতে সাধারণ রোপওয়ে অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু Funicular ropeway এতদিন কোথাও ছিল না। এখানকারটিই প্রথম। এ বছরের (২০১৮) মার্চ মাসে এটি চালু হয়েছে। থানের Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Pvt. Ltd. কোম্পানি ইউক্রেনের Promekhnizatse Consultant কোম্পানির সহযোগিতায় এটি তৈরী করেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ৩৩০ মিটার উচ্চতায় এই রোপওয়েটি যাত্রীদের নিয়ে যাবে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে। আমি সুইজারল্যান্ডে Funicular ropeway-তে চড়েছি, কিন্তু নিজের দেশের Funicular ropeway-তে, তাও আবার সর্বপ্রথম, চড়ার সুযোগ ছাড়তে আমি রাজি নই।

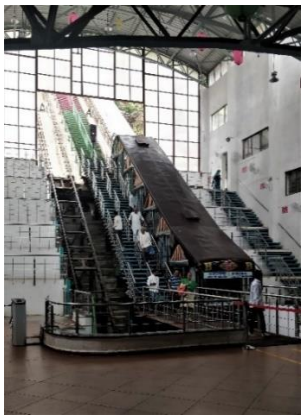

পর্বতের গায়ে সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর মন্দির ও সেখানে যাবার ফিউনিকুলার রোপওয়ে/কার সিস্টেম

আমি আমার গাইডের সঙ্গে মা অম্বে গ্যারেজ থেকে বেরোলাম। বাইরে আসতেই নজরে পড়লো গ্যারেজ আর দোকানঘরগুলোর মাথার উপর দিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। ওয়াও!

বহু উচুঁতে, চূড়ার ঠিক নীচে, পাহাড়ের খাড়া গায়ে আটকে যেন ঝুলছে সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার মন্দির। নীচে থেকে সিড়ি এবং রোপওয়ে পাশাপাশি উঠে গেছে মন্দিরের দিকে। অসাধারণ দৃশ্য। সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার নিবাসটি দারুণ জায়গায় তো! কে বানিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা কী করে বানিয়েছিলেন মাথায় ঢুকলো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা মন্দিরটির মাথার উপরে নিশ্বাস ফেলছে পাহাড়ের চূড়া। সাতটি থাকার কথা, কিন্তু এই দিক থেকে সাতটি দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য সাত না সতেরো, তা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও যুক্তি নেই। তাই আমরা এগোলাম রোপওয়ের দিকে। সামনেই, একটুখানি হেঁটেই পৌঁছে গেলাম রোপওয়ের টিকিট কাউন্টারে। বিশাল ঝকঝকে স্টেশন বিল্ডিং। দেখলে সমীহ হয়। আপ-ডাউন টিকিট মাথাপিছু ৮০ টাকা করে। একটু দামি, কিন্ত ভারতের প্রথম Funicular ropeway হিসেবে দামটা দেওয়াই যায়। আমি টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম, আর ঢুকেই চমকে উঠে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। এ কী দেখছি !

দেশে বিদেশী স্পর্শ

"Make in India".... এই স্লোগানটি নিয়ে বহু বহু রকমের আলোচনা, সমালোচনা, হাসাহাসি, প্রসংশা এবং নিন্দা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি তার মধ্যে ঢুকছি না। কিন্তু সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার মন্দিরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঝকঝকে বিদেশী চেহারার Funicular Ropeway-র ওয়েটিং হলে ঢুকে আমার প্রথমেই যে কথাটা মাথায় এল, তা হচ্ছে 'আমরাও পারি'। হ্যাঁ, আমরাও পারি। শুধুমাত্র বানাতেই নয়, মেনটেন করতে, পরিষ্কার রাখতে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ব্যবহার করতে। শুধুমাত্র দরকার একটু মোটিভেশন, বিশেষ করে শেষেরটিতে।

রোপ ওয়ের ওয়েটিং হল, কিন্তু যে কোনও এয়ারপোর্টের ওয়েটিং লাউঞ্জের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। চারদিকে ঝকঝকে কাঁচের দেওয়াল, পেশাদার চেহারার দোকান এবং দোকানদার, স্মার্ট পোশাকে স্মার্ট-তর সিকিউরিটির লোক, সদাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া স্টাফ, ঝকঝকে সুগন্ধময় বাথরুম ...। টিকিটটিও স্মার্ট টিকিট, কার্ড সোয়াইপ করে ভিতরে ঢুকলাম। একই রকম ঝকঝকে চারদিক। Funicular car-টিকে দেখলাম। চোখ ও মন দুইই জুড়িয়ে গেল। ভিতরে বসলাম। লোকজন বেশি নেই। একটু পরেই হুইসল দিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটি চলতে শুরু করলো পাহাড়ের গা বেয়ে। মসৃণ গতি। তিন মিনিট দূরে থাক, আমার ঘড়ি তো বললো দু'মিনিট সাত সেকেণ্ড। পৌঁছে গেলাম মায়ের দরবারে। আবার বলছি (নিজের ঢাক পেটানোর জন্য নয়) আমি সুইজারল্যান্ড গেছি, আরও অনেক বৈভবপূর্ণ বিদেশে গেছি, কিন্তু আজ সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার মন্দিরের রোপওয়েতে এসে মনে হল, এ অন্য ভারতবর্ষ। এ আগামীর ভারতবর্ষ।

নুনের পুতুল সাগরে

কথাটি বহু ব্যবহারে ... না, জীর্ণ নয়। অমৃত কখনও পুরোনো হয় না। অন্ততঃ আমার কাছে। জীবনটাই কেটে গেল মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে, কিন্তু যখনই কোন মন্দিরের বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়াই, তখনই আমার মাথায় ভেসে ওঠে এই ক'টি কথা -- নুনের পুতুল সাগরে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, ছোট বড় সব মন্দিরেই? উত্তরে বলতে হয়, মন্দিরের ছোট বড় হয়, ঈশ্বরের হয় কি? আজ সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার মন্দিরে দাঁড়িয়ে সপ্তশ্রুঙ্গী মায়ের অষ্টাদশভূজা মূর্তির দিকে তাকিয়ে একটা কথাই মনে হল, আমি ধন্য।

সপ্তশ্রুঙ্গী : পীঠস্থান?

আগেই বলা হয়েছে, সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর মন্দিরের শক্তি পীঠ হিসেবে সঠিক অবস্থানটি পরিষ্কার নয়। সাধারণতঃ এই মন্দিরকে পূর্ণ পীঠস্থানের মর্যাদা দেওয়া হয় না। বলা হয় অর্দ্ধ-পীঠ। সেজন্যই বলে মহারাষ্ট্রে সাড়ে তিনটি শক্তি পীঠ। পূর্ণ-পীঠ তিনটি -- কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী, তুলজাপুরের ভবানী এবং মাহুরের রেণুকা মাতা মন্দির। আর সপ্তশ্রুঙ্গী হচ্ছে অর্দ্ধ-পীঠ। কিন্তু এর মাপকাঠি বা রেফারেন্স কী, তা স্পষ্ট নয়। 'দেবী মাহাত্ম্য' অনুসারে সপ্তশ্রুঙ্গী দেবী কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী, তুলজাপুরের ভবানীরূপী মহাসরস্বতী এবং মাহুরের রেণুকা মাতারূপী মহাকালীর সম্মীলিত রূপ। 'দেবী ভাগবত পুরাণ' অনুসারে সপ্তশ্রুঙ্গী হচ্ছে পূর্ণপীঠ। বলা হয় যে সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল। তবে এই দুটি ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য প্রামাণ্য শাস্ত্র যেমন কুব্জিকাতন্ত্র বা পীঠ নির্ণয়তন্ত্রে সপ্তশ্রুঙ্গীর পূর্ণপীঠ হওয়ার উল্লেখ নেই।

পৌরাণিক এবং লৌকিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সপ্তশ্রুঙ্গীমাতা দেবী দুর্গার মহিষমর্দিনী রূপ এবং এই রূপে দেবী মহিষাসুরকে বধ করে এই সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতে বাস করছেন। লৌকিক কাহিনী অনুসারে একটি বাঘ নাকি প্রতি রাতে গর্ভগৃহে এসে পাহারা দেয় এবং ভোরে সূর্যোদয়ের আগে বাঘটি পাহাড়ে ফিরে যায়। অন্য একটি লৌকিক কাহিনী অনুসারে সিরডির সাঁইবাবাকে সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর ভক্ত হিসেবে দেখানো হয়। বলা হয় যে মহাঋষি মার্কণ্ডেয় এইখানে বসেই 'দেবী মাহাত্ম্য' রচনা করেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বতের উলটো দিকের একটি পর্বতের গুহায় তপস্যা করতেন। সেই পর্বতটিকে এখন বলা হয় মার্কণ্ডেয় পর্বত।

সপ্তশ্রুঙ্গী মন্দির

সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর মন্দিরটি আসলে ৪৫০০ ফিট উচ্চতায় পাহাড়ের গায়ের একটি গুহা। গুহার বাইরে পরে একটি মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। গর্ভগৃহটি হল গুহার ভিতরের দেওয়াল। গর্ভগৃহের বাইরের দিকে একটি রূপোর গেট আছে। সামনে দিকে আছে ভিড় কন্ট্রোল করার জন্য রেলিং। মন্দিরে ওঠার জন্য পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে ৫০১ ধাপের একটি সিড়ি বানান উমাবাই দাভাড়ে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে। আর Funicular ropeway-টি তো এ বছরের (২০১৮) সংযোজন।

সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা : আইকনোগ্রাফিতে

প্রথমেই বলি, সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার ৮ ফিট উঁচু মূর্তিটি আসলে গুহার পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা, অর্থাৎ রিলিফের কাজ, পূর্ণ মূর্তি নয়। ভক্তদের বিশ্বাস মূর্তিটি স্বয়ম্ভূ। আর একটি কথা, সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার মূর্তিটি আসলে দেবী মাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত মহালক্ষ্মীর মূর্তি। সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা অষ্টদশভূজা। ১৮টি হাতে বিভিন্ন অস্ত্র -- শিবের দেওয়া ত্রিশূল, বিষ্ণুর দেওয়া সুদর্শন চক্র, বরুণের দেওয়া শঙ্খ, অগ্নিদেবের দেওয়া অগ্নি শিখা, বায়ুর দেওয়া ধনুর্বাণ, ইন্দ্রের দেওয়া বজ্র ও ঘণ্টা, যমের দেওয়া দণ্ড, দক্ষের দেওয়া অক্ষমালা, ব্রহ্মার দেওয়া কমণ্ডলু, সূর্যদেবের রশ্মি, কালীর ঢাল ও তরোয়াল, বিশ্বকর্মার কুঠার, কুবেরের পানপাত্র এবং গদা, বর্শা, পাশ ও পদ্ম। সপ্তশ্রুঙ্গী মাতার পরণে শাড়ি ও চোলি, নাকে নাকছাবি, গলায় সোনার হার, মাথায় লম্বা মুকুট। মূর্তিটি সিন্দুরে লাল। চোখদুটি কিন্তু ঝকঝকে সাদা পোর্সেলিনের তৈরী।

উৎসব

সারাবছর ধরে তীর্থযাত্রীরা এলেও এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব হল চৈত্রোৎসব। চৈত্র মাসে রামনবমীর দিন থেকে শুরু হয় এই উৎসবটি, শেষ হয় চৈত্র পূর্ণিমার দিন। এই সময় এখানে ভীষণ ভিড় হয়। সাধারণ ভক্তরা ছাড়াও তখন সন্তানহীন দম্পতিরা সন্তান কামনায় এখানে পূজো দিতে আসেন। চৈত্রোৎসবের শেষ তিনদিনে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এখানে আসেন। সবচেয়ে ভিড় হয় চৈত্র পূর্ণিমার দিন।

সপ্তশৃঙ্গী দর্শন শেষ হল। এবার ফেরার পালা। আবার সেই ফিউনিকুলার কার। আবার সেই অভূতপূর্ব যাত্রা। রোপওয়ে থেকে বেরিয়ে অম্বেমাতা কার স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। রফিকভাই গাড়ি স্টার্ট করলেন। বিদায় সপ্তশ্রুঙ্গী মা। বিদায় সপ্তশ্রুঙ্গী পর্বত। জানিনা আর কখনও এখানে আসতে পারবো কিনা। তবে যে আসতে পারলাম, তার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

সপ্তশ্রুঙ্গী মাতা

নবজাগরণের বিস্মৃতপ্রায় মহামনীষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ইংরাজীতে মূল প্রবন্ধটির লেখক শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়[3]
বাংলা অনুবাদক যৌথভাবে 'অঙ্কুর'এর সম্পাদক দিলীপ কুমার দাস এবং লেখক স্বয়ং

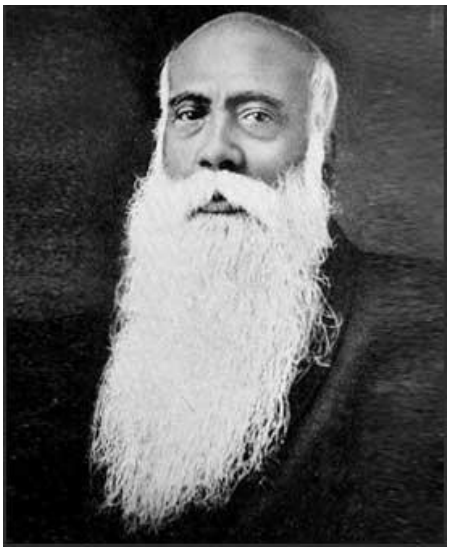

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতকে বাংলার বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক পরিসরটি ছিল বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁদের বৈদগ্ধ্যের প্রভাব বাংলা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতেও প্রসারিত হয় এবং বাংলা তথা ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা করে, যা 'রেনেসাঁ' নামে সমধিক পরিচিত। খানিকটা আশ্চর্য্যজনকভাবে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিদের একজনের কথা বর্তমান প্রায় বিস্মৃত। তিনি হলেন বহুমুখী প্রতিভাধর, বহুবিদ্যা বিশারদ, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা-সংস্কারক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)। ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিমণ্ডলটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন কলা এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং নন্দনতত্ত্ব, ভাষা এবং সাহিত্য, শিল্পকলা এবং স্থাপত্য, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্ব, গণিত এবং রাশিবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিদ্যার মত বিবিধ বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। তাঁর বৈদগ্ধ্যের বিস্তারটি কোন একটি শব্দবন্ধে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না বলেই বোধহয় তাঁর পরিচিতি ছিল 'দার্শনিক' হিসাবে। এই প্রবন্ধে আমি আচার্য শীলের জীবন এবং কর্ম নিয়ে আলোচনা করছি। আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে। এই বহুমুখী প্রতিভার আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং গভীর বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের অন্য গবেষক-লেখকদের উপর নির্ভর করতে হবে।

জন্ম, পারিবারিক পটভূমি এবং বাল্যকাল

ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় উত্তর কলকাতায়, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। তাঁর জন্মের সময় নাকি প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল। সে কারণে তাঁর নামের সাথে 'ঝোড়ো', 'স্টর্মি', 'ঝামেলার' ইত্যাদি অনাকাঙ্খিত বিশেষণগুলি যুক্ত হয়। বাবা মহেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। মা রাধারাণী দেবী ছিলেন স্নেহশীলা, নিবেদিত-প্রাণা, আদর্শ মা এবং গৃহকর্ত্রী। ব্রজেন্দ্রনাথের বাবা-মা দু'জনেই মারা যান তাঁর ন'বছর বয়স হবারও আগে। সুতরাং মামার বাড়িতে দাদুর কাছে তিনি বড় হতে থাকেন। কিন্তু দাদুও কিছুদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বড়দাদা রাজেন্দ্রনাথ পড়াশোনা ছেড়ে নিজের এবং ভাইয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন।

---

[3] শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নিউজিল্যান্ডের পামারস্টন নর্থ নিবাসী অর্থনীতির একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বাংলা ও ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও মনীষীদের জীবনী নিয়ে পড়াশোনা, লেখালেখি ও সভাসমিতিতে বক্তৃতা শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের অবসর জীবনের অবলম্বন। প্রধানত প্রাবন্ধিক হলেও কবিতা, ছোটগল্প, রম্যরচনা এবং ভ্রমণকাহিনীও তিনি লিখে থাকেন, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়।

ব্রজেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক বহুমুখীতার সাথে ব্রিটিশ দার্শনিক এবং বহুবিদ্যা বিশারদ বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৮৭২-১৯৭০) অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কাকতালীয় ব্যাপার হল রাসেলের বাবা-মাও তাঁর ছোটবেলায় মারা যান। রাসেল এবং তার ভাই ফ্র্যাঙ্ক তাঁদের দাদু-দিদিমার কাছে বড় হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের দাদুও মারা যান। অবশ্য এই দুই দাদুর পরিবারের মধ্যে একটা জায়গায় ঘোর অমিল ছিল। রাসেলের দাদু-দিদিমা ছিলেন উচ্চবিত্ত এবং সম্ভ্রান্ত, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের দাদুর সঙ্গতি ছিল সীমিত।

অতি অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারালেও 'বিভিন্ন নথিপত্র এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত সূত্র'এর সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বাবাকে স্মরণ করতে পারতেন। মহেন্দ্রনাথ গণিতশাস্ত্র এবং দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। গণিতের মধ্যে ক্যালকুলাস এবং অপটিক্স (দৃষ্টি আলোক বিদ্যা) এবং দর্শনে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩), উইলিয়াম হ্যামিল্টন (১৭৮৮-১৮৫৬) এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্ম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অগুস্ত কোঁতের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের অনুসারী ছিলেন তিনি। ব্রজেন্দ্রনাথ আবছা আবছাভাবে স্মরণ করেছেন যে তাঁর বাবা ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন এবং কলকাতার এক মৌলবীর কাছে যত্নসহকারে আরবিক আইন-কানুন শিখেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাবার বইপত্র এবং নোট থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার প্রজ্ঞা, বিশেষত ইউরোপীয় ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাবার আইনজীবী বন্ধুদের কাছ থেকে বাবার তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞান এবং তাঁর সফল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ের কথা জানতে পারেন। ব্রজেন্দ্রনাথ আরও স্মরণ করেন যে উচ্চ আয় সত্ত্বেও বাবা আয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ নিজের এবং পরিবারের জন্য খরচ করতেন। বাকি আয় যাদের প্রয়োজন তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। খুব ছোটবেলাতেই ব্রজেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মেধা এবং শিক্ষায় প্রবল আগ্রহ তাঁর বাবার দৃষ্টি এড়ায়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ এটাও স্মরণ করেছেন যে বাবা এই বয়সের তুলনায় অগ্রগণ্য, বুদ্ধিদীপ্ত এবং শিক্ষায় আগ্রহী পুত্রটির ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর উচ্চ আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করে রাখতেন।

শিক্ষা, বিবাহ এবং কর্মজীবনের প্রথম পর্ব (১৮৮৪ – ১৯১৩)

এক গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ এবং অল্প কিছুদিন অতিবাহিত করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনের প্রাথমিক বিভাগে ভর্তি হন। এটি পরে স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ মাধ্যমিক স্তরেও এই স্কুলেই পড়াশোনা করেন এবং এখান থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আগাগোড়াই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল গণিত। গণিতে তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার একটি হ'ল স্কুলের চার বছরের গণিতের পাঠক্রম তিনি প্রথম বছরেই সমাপ্ত করেন। এছাড়া গণিতের অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন তিনি তাঁর সহপাঠীদের এবং এমন কি অনেক সময় শিক্ষকদের তুলনায়ও অনেক সহজে সমাধান করতেন।

যথাসময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলেজ বিভাগে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে এফ এ (ফার্স্ট আর্ট) এবং তার তিন বছর পর অনার্সসহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এটা উল্লেখযোগ্য যে এই কলেজেই তাঁর সাথে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (সহপাঠী এবং ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথম সাক্ষাৎ হয়। নরেন্দ্রনাথ বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু ক্লাসে একবছরের জুনিয়র ছিলেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এবং যৌথ বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন কিংবদন্তি ছিল। তাঁরা দু'জনেই সেই সময়ের কলেজ প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত, অতীন্দ্রিয়বাদী এবং সংবেদনশীল কবি উইলিয়াম হেস্টি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও প্রিন্সিপ্যালসাহেব নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলেন এবং কৌতূহলী এই দুই বন্ধু নরেন এবং ব্রজেন এক গ্রীষ্মের দুপুরে সেই সহজ-সরল, ভাবে-ভোলা মানুষটির সাথে দেখা করতেও যান।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ স্নাতকস্তরের পড়া সমাপ্ত করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ মনন এবং নৈতিক দর্শনশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় গণিত, দর্শন সমেত অন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করা যেত। গণিত এবং দর্শন সহ কয়েকটি বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের দক্ষতা এতই উচ্চমানের ছিল যে স্নাতোকোত্তরে বিষয় বাছাই করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। যাইহোক, তাঁর গণিত-উৎসাহদাতা অধ্যাপক গৌরীনাথ দের ইচ্ছা এবং পছন্দের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম হিসাবে গণিতের বদলে দর্শনকে বেছে নেন। আর পরের বছরেই (১৮৮৪) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী অর্জন করে তিনি এই পাঠক্রম সমাপ্ত করেন।

এই বছরেই ব্রজেন্দ্রনাথ আসামে কর্মরত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী জয়গোপাল রক্ষিতের কন্যা ইন্দুমতির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইন্দুমতি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর ভাল দক্ষতা ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, কীটস্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ তিনি অনেক সময় স্বামীর সাথে আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁদের এই দাম্পত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চারটি পুত্র-কন্যা রেখে ইন্দুমতি অকালে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

শিক্ষক হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মজীবনকে পরিস্কারভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ছিল বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করা, আর দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। একজন ব্রাহ্মধর্মের স্বেচ্ছানুসারী হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষকজীবন শুরু করেন কলকাতার সিটি কলেজে ইংরাজীর লেকচারার হিসাবে। সিটি কলেজ ছিল ব্রাহ্মদের একটি প্রতিষ্ঠান এবং তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় কলেজ শিক্ষকদের ভারতের একটিমাত্র প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্মক্ষেত্রে পেশাগতভাবে উন্নতি করার সুযোগ সীমিত ছিল। আবার সেই সময় উচ্চমানের দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকেরও অভাব ছিল। যাইহোক, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ নাগপুরের মরিস মেমোরিয়াল কলেজে প্রথমে দর্শন এবং ইংরাজীর লেকচারার পদে যোগ দেন। খুব শীঘ্রই তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বাংলায় ফিরে আসতে হয়। বাংলায় ফিরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন।

কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই একের পর এক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ত্রিশ বছরের মধ্যে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান থেকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আর্থিক দূরবস্থা এবং নিম্নমানের ফলাফল এই প্রতিকূল অবস্থাগুলির অন্যতম। ব্রজেন্দ্রনাথের আগে এই কলেজে সাত জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। যাইহোক কলেজটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের শ্রদ্ধেয়া এবং প্রভাবশালিনী মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর পরামর্শে কলেজ পরিচালনার ভার একটি অছি পরিষদ বা বোর্ড অফ ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত হয়। মহারাণীর কাছ থেকে আর্থিক এবং নৈতিক সহায়তা পেয়ে নতুন এবং প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজটির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। অসাধারণ পণ্ডিত হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথের খ্যাতি আরো অনেক উচ্চমানের শিক্ষকদের এই কলেজে থেকে যেতে এবং যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে এটি আবার শীঘ্রই একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কলেজের বন্ধ হয়ে যাওয়া আইন-বিভাগটি পুনরায় চালু হয়। কলেজের এই পুনরুজ্জীবন ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচালন দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি ক্লাসে ছাত্রদের শিক্ষাদানের কর্মটিতেও সব সময় মনোযোগী ছিলেন। তাঁর ছাত্র এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় যে পন্ডিতপ্রবর এই অধ্যক্ষটি কলেজের নিম্ন থেকে উচ্চশ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত পড়াতেন।

বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে ন' বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কলেজের তিনি ছিলেন চতুর্থ অধ্যক্ষ এবং প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। এই কলেজটি আগের বছর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর করদ রাজ্যটিতে মেধাবী এবং উচ্চাকাঙ্খী ছাত্ররা যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য তিনি এই অবৈতনিক কলেজটি স্থাপন করেন। রাজ-এস্টেটই কলেজের খরচ-পত্র বহন করত। কলেজটি ছিল একটি উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং এখানে স্নাতকস্তরের পাঠক্রম ছাড়াও ইংরাজী ও দর্শনে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। এই কলেজে বেশ কিছু উচ্চমানের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ এবং এই বিদগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীর জন্য কলেজটি উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, যা সেই সময় মহানগর থেকে দূরে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ছিল একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এই অধ্যক্ষের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল। তিনি শুধু ছাত্রদেরই পড়াতেন না, সহকর্মীরাও তাঁর জ্ঞানের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে অনেক কিছু শিখত। ব্রজেন্দ্রনাথ নতুন কোন আকর্ষণীয় বই পেলে আহার-নিদ্রা ভুলে সারারাত ধরে তা পড়তেন। শরীরের চাহিদা এবং সুবিধা-অসুবিধার কথাও তাঁর খেয়াল থাকত না।

রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে যখন কলেজ বন্ধ থাকত তখন ছাত্ররা ব্রজেন্দ্রনাথের বাড়িতে আসত সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা এবং আলোচনা শুনতে। অনেকসময় এই আলোচনায় বহিরাগত বিদগ্ধ অতিথিরাও যোগ দিতেন। তৎকালীন জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বাগ্মী, চিন্তাবিদ এবং লেখক বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ব্রজেন্দ্রনাথের অতিথি হিসেবে এই সব আলোচনায় প্রায়শ অংশ গ্রহণ করতেন। যাঁরা ব্রজেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র দু'জনকেই চিনতেন এবং জানতেন তাঁদের কারো কারো বয়ান অনুযায়ী বিপিনচন্দ্র এই আলোচনাগুলি থেকে কি কি শিক্ষালাভ করেছিলেন তা তাঁর *'The Soul of India'* বইটিতে লিপিবদ্ধ এবং প্রতিফলিত করেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘ পনের বছর অধ্যক্ষ হিসাবে কোচবিহারে অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে কলেজের বিভিন্ন পরিবর্তনসাধনে তিনি মহারাজার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহায়তা পেয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে বাংলার, বিশেষত কলকাতার রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরটি ছিল অশান্ত এবং ঘটনাবহুল। ব্রজেন্দ্রনাথ এগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। কিন্তু অবস্থান কলকাতা থেকে দূরে হওয়ায় তাঁর দৈনন্দিন জীবনে এবং পেশাগত কাজকর্মে এগুলি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এসবের মধ্যেই কলেজের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব সামলে এই 'বুভুক্ষু পাঠকটি' সময় করে মানব-জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। মহারাজা ব্রজেন্দ্রনাথের বৈদগ্ধের এবং কলেজের উন্নতিতে তাঁর নিষ্ঠার প্রশংসা করতেন।

যদিও সংখ্যায় প্রচুর নয়, তবু ব্রজেন্দ্রনাথের লেখার গুণগত মান এবং বক্তৃতাদির সারবত্তার জন্য তাঁর খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও প্রচারিত হয়। সেই সময় পণ্ডিত মানুষদের আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। কর্মস্থলের পক্ষ থেকে রাহাখরচ ইত্যাদি বহন করার ব্যবস্থা তখন গড়ে ওঠেনি। যাইহোক কোচবিহারের মহারাজার বদান্যতায় ব্রজেন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়ে সেখানকার অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উচ্চমানের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হন। ইউরোপে তাঁর প্রথম ভ্রমণটি ছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমে। তিনি প্রাচ্যবিদ্যার দ্বাদশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কোচবিহার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। বিষয়গুলি ছিল (১) সত্য নির্ণয়ের পরীক্ষা, (২) আইনের উদ্ভব এবং সমাজবিদ্যার প্রবর্তক হিসাবে হিন্দুদের অবদান, এবং (৩) বৈষ্ণব এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের তুলনামূলক বিচার। স্পষ্টতই, উপরোক্ত বিষয়গুলি দর্শন, আইন, সমাজবিজ্ঞান, শাস্ত্র এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিস্তৃত পরিধির অন্তর্গত ছিল, যা ব্রজেন্দ্রনাথের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব সম্মেলনে উচ্চ-প্রশংসিত হয় এ কথা সিস্টার নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন। তিনিও ঐ সম্মেলনে যোগদান করে বক্তব্য রেখেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ গিয়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেন এবং সেখানে বক্তৃতা দেন। আন্তর্জাতিক স্তরে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতিসত্ত্বা কংগ্রেসে। এটি চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৫০টি দেশের ২১০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণই করেননি, তিনি তাঁর বিভাগটির উদ্বোধন এবং পরিচালনাও করেন। মূল বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে তৎকালীন বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অন্তর্নিহিত জাতি-বর্ণবৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-বিজ্ঞান, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের উপস্থাপনাটি ছিল 'জাতিসত্ত্বার উদ্ভব'এর উপর, যেটি পরবর্তীকালে 'জাতিসত্ত্বা, উপজাতি এবং জাতির অর্থ' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনাটিতে জাতিগত বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্যগুলি নিয়ে গবেষণার জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক এবং রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী যে অল্প কয়েকজন প্রতিনিধি ভৌতবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান দু'টিতেই পারদর্শী ছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের একজন। সম্মেলনে তাঁর উদ্দাত্ত আহ্বান ছিল "আধুনিক বিজ্ঞান এতদিন প্রকৃতিকে জয় করতে সচেষ্ট থেকেছে; এখন তাকে অবশ্যই সমাজ গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে।" এই আহ্বানের গুরুত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে বছর খানেকের বেশী সময় ধরে ইউরোপ-ভ্রমণ করছিলেন। কবির এই ভ্রমণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময় তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ ইংরাজীতে অনুদিত হয় এবং ইংল্যান্ডে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়। সর্বোপরি, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এর

জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথের সাথে ব্রজেন্দ্রনাথের যদিও ইংল্যান্ডে সাক্ষাৎ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ট্রান্ড রাসেলেকে ব্রজেন্দ্রনাথের কথা লেখেন। ব্রজেন্দ্রনাথকে সমসাময়িক ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদ হিসাবে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জানতে চান যে ব্রজেন্দ্রনাথ যদি কেম্ব্রিজে যান তাহলে রাসেলের পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হবে কিনা। উত্তরে রাসেল জানান যে ব্রজেন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। কোন অজ্ঞাত কারণে এই দুই দার্শনিকের সাক্ষাৎ কিন্তু হয়ে ওঠে নি।

কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৩ – ৩০)

উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে ব্রজেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষক এবং আর্থিক অবলম্বন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এবং মুক্তহস্ত এই মহারাজার অবর্তমানে কলেজের পরিচালন পদ্ধতিতে অবশ্যই পরিবর্তন আসে। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যা এতদিন শুধুমাত্র ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। এর যোগ্য, সাহসী এবং দূরদর্শী উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চমানের উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছিল। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন সমেত অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম এবং গবেষণা চালু হয়। বিভিন্ন বিষয়ের কৃতবিদ্য পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হয় শিক্ষক/অধ্যাপক পদগুলিতে যোগ দিতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজেও একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্রজেন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত এবং তাঁর বহুমুখী বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান মনন এবং নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক পদটি অলঙ্কৃত করতে। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম King George V অধ্যাপক পদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই পদে তিনি পরবর্তী সাত বছর আসীন ছিলেন। তাঁর উৎসাহে এবং নেতৃত্বে দর্শন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি ব্যাপক উৎকর্ষ এবং পরিচিতি লাভ করে। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই ব্রজেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাঁর প্রেরণায় ভারতীয় দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দ্বন্দ্ববাদ তর্কবিদ্যা পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাঁর আত্ম-প্রচারবিমুখ, বিধিবর্হিভূত-অপ্রচলিত জীবনযাপন এবং সহজগম্যতা তাঁকে একজন জনপ্রিয় শিক্ষক এবং পথনির্দেশক পরামর্শদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। পরে দেখব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেও ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান কেমন ছিল।

চতুর্থ নলবাডি কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ার

এর পরবর্তী পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে। ব্রিটিশ শাসনাধীন করদ রাজ্য মহীশূরের (বর্তমান কর্ণাটক) রাজাদের খ্যাতি ছিল শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, সমাজ-সচেতন, বিবেকবান শাসক হিসাবে। তাঁদের শাসনে রাজ্যটি ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে সচ্ছল এবং শান্ত। প্রজারা শিক্ষিত ছিল, কিন্তু রাজ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। মহারাজা চতুর্থ নলবাডি কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ার (১৮৮৪ – ১৯৪০) নিযুক্ত শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা মহীশূরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোন করদ রাজ্যে এটি ছিল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতে ষষ্ঠ। এর প্রথম উপাচার্য বিখ্যাত পণ্ডিত জুরি এইচ ভি নানজুনদাইয়া কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে মহারাজা ব্যক্তিগতভাবে ব্রজেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ এবং ইংল্যান্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল এ স্যাডলারের পরামর্শক্রমে মহারাজা এই আমন্ত্রণটি পাঠান। স্যাডলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে তার উন্নতিসাধনের জন্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রজেন্দ্রনাথও এই উপদেষ্টা কমিটির কাজকর্মে অংশ নিয়েছিলেন। এই সূত্রে স্যাডলার ব্রজেন্দ্রনাথকে ভাল করে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রভূত প্রশংসা করে মহারাজাকে স্যাডলার লিখেছিলেন, "বহু বিষয়ে জ্ঞানের এবং মৌলিক চিন্তার গভীরতায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে ব্রজেন্দ্রনাথের তুলনীয় দ্বিতীয় কোন পণ্ডিত মানুষ নেই।"

সেই সময় তাঁর নিজের শহর কলকাতায় বন্ধুবর্গ এবং অনুসারীদের সাহচর্যে ব্রজেন্দ্রনাথের দিনগুলো ভালই কাটছিল। সুতরাং মহীশূর যেতে প্রথমে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বেশ কয়েকজন বন্ধু, যাঁদের মধ্যে ইংরেজ পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং ভারতবিদ্ এডোয়ার্ড জন টম্পসন ছিলেন, যিনি মহারাজা এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দুজনকেই জানতেন, তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেন উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। তাঁদের মনে হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য খুবই উপযুক্ত এবং সহায়ক হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ অবশেষে রাজী হলেন।

টম্পসন লিখেছেন যে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের পদ গ্রহণের সম্মতি-পত্রটি স্বহস্তে পোস্ট করেন, যাতে এই দোদুল্যচিত্ত দার্শনিকটি আবার মত পরিবর্তন করে না বসেন!

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেই পদে আসীন ছিলেন। অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রথমদিকে একটু-আধটু অসুবিধা হলেও, এই ন' বছরের কর্মকাল তাঁর পক্ষে প্রভূত ফলপ্রদ হয়েছিল। তিনি শুধু একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারই ছিলেন না, মহারাজা রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সাথে শলা-পরামর্শও করতেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার

ব্রজেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসার বিশালত্বের তুলনায় তাঁর লিখিত প্রকাশনার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অপ্রতুল। এ ছাড়া আর একটি ব্যাপার হ'ল এই যে তাঁর প্রকাশিত লেখার অনেকগুলিই আর সহজলভ্য নয়। তাই প্রবন্ধটির এই অংশে ব্রজেন্দ্রনাথের লেখালিখির পুর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে বাছাই করা অংশবিশেষই রাখা হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য কোন সমালোচনার মধ্যে না গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত রচনাদির বিশিষ্টতা ও বিস্তৃতির সঙ্গে পাঠকের কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

ব্রজেন্দ্রনাথের সব লেখাতেই স্বকীয়তা ও মৌলিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে খ্যাতিমান অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তুলনা করলে ব্রজেন্দ্রনাথের পান্ডিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি নজরে আসে সেটি হ'ল তিনি একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং লিখেছেন। তাই তাঁর লেখায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত।

সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা: ইউরোপীয় সাহিত্য

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় লেখা *New Essays in Critisism* নামে ব্রজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়। বইটিতে প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল সাতটি এবং এগুলি লেখা হয়েছিল ১৮৮২ থেকে ১৮৯১ এর মধ্যে। এর মধ্যে দুটি প্রবন্ধ সেই সময়কার প্রসিদ্ধ ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'The *Calcutta Review* তে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপীয় ও বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত তথ্যবহুল এই প্রবন্ধগুলিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিবর্তন কি ভাবে সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয় তা আলোচনা করেছেন। জার্মান দার্শনিক ফ্রেড্রিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) সাহিত্যের প্রকারভেদ চিহ্নিত করার জন্য সাহিত্যকে প্রাচ্য, ধ্রুপদী ও রোমান্টিক এই তিনটি ধারায় ভাগ করেছিলেন। একসময় ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলকে 'আদি-গুরু' (Early Master) বলে মানতেন, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি বা রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি হেগেলের মতবাদটিক সংকীর্ণ ও 'প্রাদেশিক' (provincial), অর্থাৎ পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক, আখ্যা দিয়ে বর্জন করলেন। তিনি নিজে এর বদলে প্রস্তাব করলেন তিনটি সংস্কৃতি-ভিত্তিক বিভাজন যাদের নাম দিলেন মিশর-ব্যবীলনীয়, গ্রীক-রোমীয় এবং ভারত-চীন-জাপানী। তাঁর মতে নিজ নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি থেকে এই তিনটি সাহিত্যধারার উৎপত্তি হয়েছে এবং এদের বিবর্তন হয়েছে স্বাধীনভাবে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও গতিতে। শুধু সাহিত্যেরই নয় দর্শনের এবং ইতিহাসের ধারাও, হেগেলের মতে, মসৃণ সরল রেখার পথে এগোয়। ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধারণাটিকে অচল আখ্যা দিয়ে চিন্তার জগতে তাঁর আদি-গুরুর থেকে নিজেকে আরও সরিয়ে নিলেন।

যদিও প্রবন্ধের অন্যত্র ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা হবে এখানে প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যাক যে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কেও হেগেল সহ সমসাময়িক ইউরোপীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিছুটা অবজ্ঞার বা তাচ্ছিল্য-ভরা। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও তার আহরণ সম্পর্কে যে তত্ত্বগুলি আছে তাকে ইউরোপীয়রা যুক্তিভিত্তিক নয়, অনুমানভিত্তিক বলে দেখতেন। তাদের মতে ভারতীয়দের প্রবণতা যুক্তির বাইরে 'গুরুমুখী' (authority) জ্ঞানে অধিকতর আস্থা রাখা। ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধারণাগুলিকে বললেন অজ্ঞতাপ্রসূত এবং ভ্রান্ত। ভারতীয় দর্শন-পদ্ধতির যুক্তিবাদিতা ইউরোপীয় দর্শনের সমকক্ষ এই মতবাদ উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সহ প্রচার করলেন তাঁর লেখার মাধ্যমে, জোরালো ভাষায়।

এই গেল হেগেল প্রস্তাবিত সাহিত্যরীতি ও সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথের বিকল্প প্রস্তাব। এবার তাঁর ইউরোপীয় সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে আসা যাক। যে সাতটি প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি ছিল ইংরেজ কবি জন কীট্স্ সম্পর্কিত। একটি প্রবন্ধে তিন খন্ডে আলোচনা করেন কীট্সের কাব্যরীতি ও কবি-মানসিকতা সম্পর্কে, আর

অন্যটিতে কীট্‌সের মহাকাব্যধর্মী কাব্য 'হাইপেরিয়ান'এর বিভিন্ন বিষয়। কবি কীট্‌সের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে যাদের পরিচিতি আছে তাঁরা জানবেন যে 'হাইপেরিয়ান' একটি অসমাপ্ত রচনা। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় এই বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন।

শুধু ইংরেজি সাহিত্যই নয়, ব্রজেন্দ্রনাথ ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, রুশ এবং স্পেনীয় সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের রচিত বিষয়বস্তু নিয়ে তুলনামূলক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কি ভাবে সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে ব্রজেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেশের ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০) ও ফরাসি ফ্রাঁসোয়া কেনের (১৬৯৪-১৭৭৪) চিন্তা-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার কথা উল্লেখ করছেন। আবার সাহিত্যের বিবর্তন অনেকাংশে যে গাণিতিক পদ্ধতি বা চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ও ফরাসি জীববিদ্যবিশারদ জঁ ব্যাপ্তিস্ত লামার্কের (১৭৭৪-১৮২৯) জীবজগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের রীতিনীতিও মেনে চলে এই মৌলিক তত্ত্বটি ব্রজেন্দ্রনাথ উত্থাপন করেছেন নানা উদাহরণ সমেত। সাহিত্য-ইতিহাস সহ ইতিহাসমাত্রেরই গতিকে খন্ড-খন্ড ঘটনার সমষ্টি হিসেবে না দেখে বিবর্তনশীল প্রবাহ হিসেবে বিবেচনা করা অধিকতর অর্থবহ বলে ব্রজেন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে।

বাংলা সাহিত্য

যুবক রজেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ নিয়ে যে পর্য্যালোচনা করেছেন সেটি যে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের প্রায় পাঁচশ বছর ধরে সৃষ্ট সাহিত্যের সঞ্চয় এই ব্যাপারটি মনে করলে তাঁর প্রচেষ্টার গুরুত্ব বিশেষভাব বোঝা যায়। তাঁর এই ধারাবাহিক আলোচনাটি শুরু হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস ওঝা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসকে নিয়ে। বাংলাভাষায় অনুদিত কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' আজও বাঙ্গালীর আদর ও শ্রদ্ধার বস্তু। সেই সময়কার প্রচলিত বাংলাভাষা যে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করার মাধ্যম হতে পারে এটি অনেকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার যে দুটি মহাকাব্যকে আশ্রয় করে বাংলার এই দুই 'আদি-কবি' তাঁদের অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সে দুটির আখ্যান ভারতীয় সংস্কৃতির চির-পরিচিত কাহিনীভান্ডারেরই অংশ। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কবিপ্রতিভা, কল্পনা ও প্রচলিত কাব্যপদ্ধতির সমন্বয় তাই সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্যের দুটি আদৃত সম্পদ। সাহিত্যের বিবর্তনে এই সৃষ্টির স্থান ও প্রয়োজনীয়তা ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্যের অগ্রগতির প্রাথমিক পর্য্যায়ে রচিত এই ধরণের কাব্যের আর একটি উদাহরণ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ এর পর এনেছেন অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরে কাব্যসৃষ্টিকে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাদিকে উপাদান করে সর্বসাধারণের বোধগম্য বর্ণনাপদ্ধতির প্রয়োগে সৃষ্ট এই কাব্য রসের বিচারে হয়ত বা কিছুটা স্থুল বা অপরিণত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের মতে এদের উপস্থিতি ভাষা এবং সাহিত্যের বিবর্তনকে এক বিশেষ পর্য্যায়ে সাহায্য করেছে।

বাংলা সাহিত্যের এই আদি কালে যে গুণগুলির অভাব লক্ষ্য করা যায়, বিবর্তনের ক্রমবিকাশের পথে সেগুলি পূরণ হতে শুরু হল ঊনিশ শতকের সাহিত্যে। ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় এরপর এলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) যাঁর রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি অনেক দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে যুগ-সৃষ্টিকারী কীর্তি বলে সমাদৃত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের বিচারেও এই কাব্যগ্রন্থটির ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং গুণগত মান বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথে এক্‌টি বলিষ্ঠ নূতন পদক্ষেপ।

ঊনিশ শতকে বাংলা গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের বিস্তৃতি ও অগ্রগতি হয় বহুমুখী। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে এগুলির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আগ্রহী পাঠকের সামনে আসে। এই সব সাহিত্যিকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের পর ব্রজেন্দ্রনাথ আলোচনা করলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) রচিত মহাকাব্যদ্বয় 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যা'। ব্রজেন্দ্রনাথের বিবেচনায় এই কাব্যদুটির উপাদান যদিও দেশজ, সাহিত্যরীতির প্রয়োগে ও রচনার আঙ্গিকে এগুলি অনেকাংশে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। সমসাময়িক ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে রচিত একটি কাব্যিক আখ্যান হ'ল কবি নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) 'পলাশির যুদ্ধ'। আর ভিন্ন ভিন্ন কবিতার সঙ্কলনে নবীনচন্দ্রেরই অন্য একটি কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'। এই দুটির সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯- ১৮৯৪) রচিত 'অবসর-সরোজিনী'র কবিতাগুলি আলোচনা করে ব্রজেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এঁদের অবদানও স্বীকৃতির দাবী রাখে, যদিও এঁদের রচনাশৈলীতে উন্নত মাপের কল্পনার ছাপ নেই। এই কবিতাগুলির আঙ্গিক তাই কিছুটা 'মেকি' (artificial)।

ইউরোপীয় সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা ও ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে 'নব্য-রোমান্টিক' পদ্ধতিটি সৃষ্টি হয়েছিল তার উৎস হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন স্রষ্টার হৃদয়ের গভীর চেতনাকে এবং তাঁর অন্তরের চাওয়া-পাওয়ার গরমিল থেকে উদ্ভূত এক ধরণের আত্মিক অভাববোধকে, যার পরিমাপ বা বিচার বহির্জগতের কোন মাপকাটির মাধ্যমে করা যায় না। যে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের লেখায় তিনি এই ধারাটির সন্ধান প্রথম পেলেন তিনি শ্রীমতী তরু দত্ত (১৮৫৬- ১৮৭৭)। তরু দত্ত যদিও বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় নয়, ইংরেজি এবং ফরাসিতে। কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা তরু দত্ত তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের বেশ কয়েক বছর তাঁর খ্রীষ্টান পিতামাতার সঙ্গে ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য তাই সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপের পটভূমিকায়। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখায় মন দেন এবং ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কিছু কিছু লিখতেও শুরু করেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। অনেক সাহিত্য সমালোচক তাঁর রচনায় প্রতিভার ছাপ আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই প্রতিভার বিকাশ পূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই তরু দত্তের মৃত্যু হয় যক্ষ্মা রোগে, মাত্র একুশ বছর বয়সে।

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে এই নব্য-রোমান্টিক ধারাটির ছাপ, কিছুটা হলেও, ব্রজেন্দ্রনাথ পেলেন সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯২২) 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' উপন্যাসে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি লেখকের স্ত্রীর অকাল-বিয়োগের গভীর ব্যাথা থেকে সৃষ্ট। ব্রজেন্দ্রনাথ এই উপন্যাস্‌টিকে গদ্য-কাব্য (prose rhapsody) আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উচ্চমানের কারণে এই উপন্যাসটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ এটিকে নব্য-রোমান্টিক সাহিত্যকলার প্রাথমিক পর্য্যায়ের ঊর্ধে স্থান দিতে চান নি, কারণ এটির বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী, তাঁর বিচারে, নেতি-বাচক ও আত্ম-কেন্দ্রিক।

এরপর ব্রজেন্দ্রনাথ গ্যেটে, ম্যাথু আর্ণল্ড, কীট্‌স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সুইনবার্ণ, শেলি, ডি কুইন্সি ও ভিক্টর হিউগোর মত সুবিখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের রচনাদির স্বল্পায়তন একটি আলোচনা করেছেন এবং তার আলোকে তুলনামূলক ভাবে ঊনিশ শতকের নির্মীয়মান বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের এই দীর্ঘ ও সযত্ন পরিক্রমায় ব্রজেন্দ্রনাথ অবশেষে পৌছলেন তাঁরই সমসাময়িক তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'(১৮৮২) ও 'প্রভাতসঙ্গীত'(১৮৮৩) এর কবিতাগুলির মধ্যে দেখতে পেলেন উচ্চমানের নব্য-রোমাণ্টিক কাব্যপদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ। কবিতাগুলির নামকরণ, বিষয়বস্তু ও কল্পনার বৈচিত্র্য এবং চিত্রকল্পের (imagery) বর্ণাঢ্য উৎকর্ষতা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে একটি নতুন উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে বলে উচ্ছ্বসিত ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের আগত-প্রায় রবীন্দ্র-পর্বকে স্বাগত জানালেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে পবিত্র যমুনার তীরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ-মিলন সম্বলিত যে মধ্যযুগীয় কবিতা বা গানগুলি রচনা করেছিলেন সে গুলির কল্পনা-মাধুর্য্য বাংলা সাহিত্যে নব্য-রোমান্টিক ধারাটির উন্নততর প্রকাশ বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি এই রচনাগুলিতে কীট্‌স ও ব্রাউনিং এর মত ইংরেজ কবিদের সৃষ্ট কাব্যের ছাপ লক্ষ্য করলেন। প্রসঙ্গত এই ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য যে প্রথম যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সমাদর ও স্বীকৃতি যে স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালী জানিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য কৃতী স্রষ্টাদের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল, কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিশ্রুতি যে বিপুল সম্ভাবনা-পূর্ণ এবং ব্যতিক্রমীতার অগ্রদূত এই তথ্যটি ব্রজেন্দ্রনাথই সম্ভবত সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছিলেন। এই দুই বাঙ্গালী মনীষী আজবীন পরস্পরের গুণগ্রাহী সুহৃৎ ছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ব্যাপ্তি ও দীপ্তি শুধু বাংলা সাহিত্যকেই নয়, বাংলা তথা সারা ভারতের জাতীয় জীবনকে আলোকোজ্জ্বল করেছিল দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৩১ সালে কবির সত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার উপলব্ধিকে আরও একবার শ্রদ্ধা জানান এই বলে যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বমানবতার চর্চা করে সাধারণ মানুষের নিত্যকালীন অভিজ্ঞতাকে এক শাশ্বত সত্ত্বার সন্ধান এনে দিয়েছে।

বাংলার সাহিত্য জগতে ঊনিশ শতকের গুরুস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। বঙ্কিমের পরিচয় শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম চিন্তানায়ক হিসেবেও। একদিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অতি অল্পসংখক ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চপদতস্থ ভারতীয় আমলাদের একজন। অন্যদিকে সংস্কৃতভাষা-ভিত্তিক সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতারও তিনি গর্বিত ধারক ও বাহক। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি আয়তনে বিপুল এবং বৈচিত্রময়। ভারতীয় ভাষায় রচিত উপন্যাস সাহিত্যের তিনি জনক। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির

স্বরূপ বিশ্লেষণে ও সমাধানের সন্ধানে পথপ্রদর্শক। ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্য ও হিন্দু-ধর্মীয় চিন্তার জগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বঙ্কিমের সাহিত্য ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে লেখাগুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বঙ্কিম বাঙ্গালীকে চিন্তার জগতে স্বকীয়তা ও মানসিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। অবশ্য বঙ্কিমের চিন্তার জগত যে মিল, স্পেন্সার, ডারউইন এবং বিশেষত আগুস্ত কোঁতের মত ইউরোপীয়দের 'পজিটিভিজম' বা বস্তুনিষ্ঠ আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে এই কথাটিও ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন।

আবার, অন্যদিকে, হিন্দু ধর্মের বহু দেব-দেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজার প্রচলিত রীতিনীতির সদর্প পুনরুদ্ধারের চলমান প্রয়াসে বঙ্কিম যে শুধু সম্মতিই নয় বুদ্ধিগত নেতৃত্বও দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন তাঁর এক কঠোর সমালোচক। বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' বা 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' জাতীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের যে ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণের ('historic reconstruction') জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাকে ব্রজেন্দ্রনাথ পান্ডিত্য, অনুভূতিশীলতা এবং ঐতিহাসিক সমালোচনার রীতিনীতি ও পদ্ধতির বিচারে 'তুচ্ছ' ('slight') বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরণের ইউরোপীয় প্রচেষ্টার উদাহরণ স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনাথ Bruno Bauer (1805-82) বা David Strauss (1808-74) এর যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত বিতর্কিত রচনাগুলি উল্লেখ করেছেন এবং তুলনামূলক বিচারে বঙ্কিমের রচনাগুলিকে এদের চেয়ে নিম্নমানের এবং বিবেচনার অযোগ্য বলে মনে করেছেন।

এটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার যে ব্রজেন্দ্রনাথের মত একজন পরিচয়হীন, নবীন বাঙ্গালী লেখক বিচার করছেন এবং কঠোর নির্দ্বিধ রায় দিচ্ছেন এমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতিমান সাহিত্যিক সম্পর্কে যিনি তখনও জীবিত এবং লেখালেখিতে ব্যস্ত। আন্দাজ করা যেতে পারে যে ব্রজেন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি বঙ্কিমের নজরে এসেছিল। কিন্তু তাঁর কোন প্রতিক্রিয়ার নজির পাওয়া যায় না।

ইংরেজি-শিক্ষিত বিদ্বজ্জন সমাজ এই প্রবন্ধগুলি কি ভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন তার সমসাময়িক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে একটি অসাধারণ মূল্যায়ন আসে অপ্রত্যাশিত একটি সূত্র থেকে কি ভাবে তা দেখে নেওয়া যাক। কলকাতায় ব্রজেন্দ্রনাথের অনুরাগীরা তাঁর মৃত্যুর পর একটি স্মরণসভায় মিলিত হন ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে। এই উপলক্ষ্যে সভাতে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য মার্জনা চেয়ে লন্ডন থেকে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত-প্রেমী সুলেখক ইংরেজ এডোয়ার্ড টম্পসন। স্মৃতিচারণের মধ্যে টম্পসন বিশেষভাবে উল্লেখ করেন 'দ্য ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধগুলির কথা। তিনি স্মরণ করেন, "১৮৯০ সালে 'দ্য ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এক তরুণ যুবকের লিখিত 'সাহিত্যে আধুনিক রোমান্টিক আন্দোলন' বিষয়ে এক অত্যাশ্চার্য ধারাবাহিক প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল, যে যুবক সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-স্তর অতিক্রম করেছেন। এই ভারতীয় তরুণ বিদ্যার্থী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উন্নত মাধুর্যমণ্ডিত ইংরেজি ভাষায় কোন ত্রুটি না রেখে অথবা ছন্দ-লয়ের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে লিখে চলেছেন। তিনি লেখার মধ্যে অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে, কোনরূপ হীনমন্যতা প্রকাশ না করে, বা অহেতুক জাতীয়তাবোধের দম্ভে উৎফুল্ল না হয়ে, সুস্থিরচিত্তে ও সতর্কভাবে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।"

বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র

যদিও গণিতশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথা আগে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের পঠন-পাঠনের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল না। তা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলিতে তাঁর লিখিত কাজকর্ম মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় বহন করছে। যে ঐতিহাসিক পটভূমি ব্রজেন্দ্রনাথ সহ ভারতীয় বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজনকে এই ধরণের প্রয়াসে প্রেরণা জুগিয়েছিল তার অনুসন্ধান সংক্ষেপে করা যাক। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের সদম্ভ আধিপত্যের যুগে দেশজ জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রাচীন সংস্কৃতি অবহেলা ও অবজ্ঞার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেই চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির জগতে ইউরোপের প্রাধান্য নির্বিচারে স্বীকারও করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের নানা কুফলের মধ্যে বোধহয় সর্বাধিক ক্ষতিকর ছিল শাসিতের চরিত্রে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করতে শেখানো। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্বে দুটি পরস্পর-বিরোধী সাংস্কৃতিক লেনদেন শুরু হয়েছিল বলা যায়। এক দিকে ইউরোপীয় ধারণায় ভারতীয়দের চিন্তার জগত যে ধর্ম-ভিত্তিক ভাবালুতার পরিচায়ক এই মতটি প্রচারিত হল সরবে, আবার অন্যদিকে ইংরেজ-সহ বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় জ্ঞানান্বেষী পন্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের চর্চা ও গবেষণায় উদ্যোগী হলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দু'জন ইংরেজ হলেন ভাষা-তাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ ভারত-বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ (১৭৪৬-৯৪) এবং সংস্কৃতভাষা ও গণিতজ্ঞ হেন্‌রি কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)। প্রধানত ভারতীয় বিষয়বস্তুর চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে উইলিয়াম জোন্‌সের উদ্যোগে কলকাতায় (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুই পন্ডিতই ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচালক। এঁদের ব্যক্তিগত উৎসাহ, উদ্যোগ ও গবেষণায় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান পুনরাবিস্কার এবং দেশে-বিদেশে প্রচারের কাজটি শুরু হয়। এই পরিচিতির ফলে ইউরোপের নানা দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সহ ভারতীয় বিদ্যার চর্চা, বিশ্লেষণ ও প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সন্ধান উৎসাহী ইউরোপীয়দের কাছে পৌঁছয়।

আশাব্যঞ্জক এই সব উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে ভারতীয়দের নিজস্ব সৃষ্টি ও অনেকাংশে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমতুল এই ব্যাপারটি তেমন মান্যতা পায় নি। এটি ইংরেজি শিক্ষিত অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীর হতাশার কারণ হয়ে ওঠে। সুদক্ষ বাঙ্গালী বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) ছিলেন এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। প্রধানত রসায়নবিদ হলেও তাঁর ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিতি এবং সঙ্গে ছিল প্রবল জাত্যাভিমান। তিনি ফরাসি বৈজ্ঞানিক Marcellin Berthelot (1827-1907) এর লেখা বিজ্ঞানের ইতিহাসে পড়লেন যে প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন (alchemy) আরবদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আরবরা এই জ্ঞান পেয়েছিল গ্রীকদের থেকে। অর্থাৎ জ্ঞানের রাজ্যে সব আহরণের আদি সূত্র গ্রীক সভ্যতা। প্রফুল্ল চন্দ্র বার্থেলোকে লিখলেন যে ভারতে রসায়ন চর্চা আরব সভ্যতার সঙ্গে ভারতের আদানপ্রদান শুরু হবার আগের। উদাহরণ স্বরুপ তিনি উল্লেখ করলেন যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা পারদ (mercury) ব্যবহার করে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। বার্থেলো তাঁকে ব্যাপারটি আরও অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নত-মান সংক্রান্ত দাবীগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রফুল্ল চন্দ্র নিজেও অনুভব করলেন। তিনি বললেন প্রাচীন ভারতে ভৌত-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল এবং পাটিগণিত-বীজগণিত ভিত্তিক গাণিতিক পদ্ধতিগুলির ব্যবহারও ভারতে ছিল। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতকে গণিতশাস্ত্রের 'আঁতুড়-ঘর' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যাদি কোথায়? এই অভাববোধ থেকেই প্রফুল্ল চন্দ্র নিজে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদি পড়তে শুরু করলেন এবং বিশেষজ্ঞ অন্যান্য পন্ডিতদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। বেশ কয়েক বছরের একনিষ্ঠ পঠন-পাঠন ও গবেষণার ফসল হিসেবে পাওয়া গেল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' (*A History of Hindu Chemistry, vol. 1)* শিরোনামের মহাগ্রন্থটির প্রথম খন্ড। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত কোন ভারতীয় ইতিপূর্বে এই ধরণের গবেষণা করেন নি। এই বইটি তাই ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মানুসন্ধানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একটি স্মরণীয় মাইলফলক। 'হিন্দু' শব্দটি অবশ্যই এখানে কোন ধর্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতির মাধ্যম এই শব্দটি।

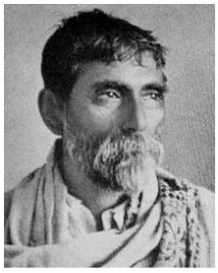
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

প্রফুল্ল চন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু মন এখানেই থেমে গেল না। তাঁর এই বিশাল অবদানটির মধ্যে তিনি যে বড়মাপের অভাবটি অনুভব করলেন সেটি হল হিন্দুদের আণবিক তত্ত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বাদির আলোচনার। তাঁর মতে বিজ্ঞানের, বিশেষত রসায়নের, ইতিহাস নিয়ে যে সব ইউরোপীয় পন্ডিত চর্চা করেছেন তাঁরা গ্রীক সভ্যতাকে আণবিক বিজ্ঞান সহ সর্ববিধ জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেছেন। কিন্তু আণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু সভত্যার চিন্তা ও অবদান ব্যাখ্যা করার মত গুণী বিজ্ঞনী সাম্প্রতিক কালে পাওয়া যায় নি। তিনি জানালেন তাঁর বইটিতে তিনি এই বিষয়টি সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করেছেন তা হেনরি কোলব্রুকের থেকে ঋণ নেওয়া, এবং তা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। অথচ তাঁর নিজের এই কাজটি করার যোগ্যতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাই তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ('encyclopaedic') ব্রজেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলেন হিন্দু আণবিক তত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা করার উপরোধ নিয়ে।

ব্রজেন্দ্রনাথ রাজী হলেন এবং প্রফুল্ল চন্দ্রের 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' বইটির দ্বিতীয় খন্ডের দুটি অধ্যায় তিনি লিখলেন। এই বইটি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হিন্দু বিজ্ঞান-চর্চার যে ধারাটি 'বস্তুনিষ্ঠ', অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি-নির্ভর পরীক্ষা-

নিরীক্ষার ভিত্তিতে গ্রথিত, তিনি সেই ধারাটি অনুসরণ করে তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখলেন। তাই এটিকে তিনি 'positive science' আখ্যা দিয়েছেন। এই কাজটিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান অনুশীলনে ভারতীয় সভ্যতার এক হাজার বছরের অবদান মূল্যায়ন করেছেন গ্রীক অবদানের পাশাপাশি। সময়টি শুরু হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে।

প্রফুল্ল চন্দ্রের বইটির দ্বিতীয় খন্ডে যে দুটি অধ্যায় তিনি লিখলেন সেগুলির একটি ছিল প্রাচীন ভারতের ভৌত-রসায়ন ও যান্ত্রিক (physico-chemical and mechanical) প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত তত্ত্বাবলি এবং অন্যটিতে জ্ঞানানুসন্ধানের পদ্ধতি (scientific methodology) সম্পর্কিত ভারতীয় মতবাদ। তিনি জানালেন যে প্রাচীন ভারতে বস্তুভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আরও দুটি ধারা ছিল যার একটি পরা-ভৌতিক (metaphysical) এবং অন্যটি কল্পিত আখ্যান-ভিত্তিক (mythological)। ভারতীয় সংস্কৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতিরগুলির সঙ্গে এইগুলির গুরুত্বও স্বীকার করে, যেটা প্রাশ্চাত্য সভ্যতা হয়ত ততটা করে না। সেখানে বস্তুনিষ্ঠতা বা 'পজিটিভিজমের'ই জয়জয়কার। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'পজিটিভ' বিজ্ঞান অণ্বেষায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য দুটি ধারণাও প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ বলে স্বীকার করে নিয়েও সে গুলি ব্যবহারে বিরত থেকেছেন। এই দুটি অধ্যায়ের প্রথমটির বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত থিসিসের ভিত্তিতে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

এই কাজটি অবশ্যই ছিল প্রচন্ড পরিশ্রমসাধ্য। এটি যখন লেখেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কোচবিহারের বাসিন্দা, তাই কোন ভাল লাইব্রেরি ব্যবহার করা বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ তাঁর খুব একটা নিশ্চয় ছিল না। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় তথ্য-সম্বলিত অংশগুলি। তারপর সে গুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার উপযোগী পরিভাষা সৃষ্টি করে তাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন জাতীয় বিষয়ের জটিল তত্ত্বগুলির আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার মত বহুমুখী প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য বহন করে এই গবেষণাটি। তাঁর আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলির সবক'টিই যে সরাসরি কোন না কোন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আহরিত এ কথা তিনি সগর্বে উল্লেখ করেছেন।

প্রফুল্ল চন্দ্রের উপরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করেই কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ থেমে গেলেন না। এই কষ্টসাধ্য গবেষণার অভিজ্ঞতা যেন তাঁর জ্ঞানপিপাসু মনকে উদ্দীপিত করল এই পথে আরও এগিয়ে যেতে।

হিন্দু সভ্যতায় বিজ্ঞান সহ সমগ্র জ্ঞানের অনুসন্ধানের ভিত্তি প্রধানত দর্শনশাস্ত্রে, যা ছয়টি শাখায় বিভক্ত এবং ষড়-দর্শন নামে পরিচিত। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ এই শাস্ত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার অনুসন্ধান যেটি তিনি আংশিক ভাবে করেছিলেন সেটিকে পূর্ণতর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোচবিহার ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিয়োগ পেয়ে। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিজ্ঞান গবেষণাতেও তিনি সময় ও মনোযোগ দিলেন। যে দুটি প্রবন্ধ তিনি আগেই লিখেছিলেন তার সঙ্গে আরও পাঁচটি প্রবন্ধ লিখলেন যেগুলিকে তিনি 'পুস্তিকা' (monograph) বলেছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় চিন্তা ও অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (synoptic view) দেওয়া। সাত অধ্যায়ে লিখিত যে বইটিতে এই গবেষণাগুলি প্রকাশিত হল তার নাম '*The Positive Sciences of the Ancient Hindus*'। প্রকাশনার সাল ১৯১৫। এই বইটির আলোচ্য সময়ের দৈর্ঘ্য হাজার বছরেরও বেশী।

ভৌত-বিদ্যা, রসায়ন ও যান্ত্রিক পদ্ধতি সক্রান্ত তত্ত্বগুলি ছাড়াও এই বইটিতে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রাচীন হিন্দু ধারণাগুলি। প্রতিটি অধ্যায়ে মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন গতিতত্ত্ব (speed or motion), শক্তিতত্ত্ব (energy, including kinetic and potential), ধ্বনিতত্ত্ব (acoustics), আলোকতত্ত্ব (theories of light) ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে ভৌতবিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে। হিন্দু রসায়নে স্নেহ বা তৈলজাতীয় (fats and oils) পদার্থের রাসায়নিক উপাদান নিয়ে আলোচনা আছে আর আছে রসায়নের ব্যবহারিক প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ, যেমন উদ্ভিদের থেকে নীল রঙের (indigo) আহরণ, ইস্পাতকে কঠিনতর করার প্রক্রিয়া, 'বজ্রলেপ' বা সিমেন্ট প্রস্তুত করার পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথ জানালেন যে এই ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রাধান্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে। তাই ভারতীয় বিজ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধির জগতকেই নয়, দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলিকেও সমৃদ্ধ করেছে।

হিন্দুদের আণবিক তত্ত্ব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অঙ্গ। এই তত্ত্বগুলি কি ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের আণবিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় তা ব্যাখ্যা করার আগে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রয়োজনীয় মূল সূত্রগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত (দেবনাগরি) অক্ষরে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থে, তারপর ভৌত-বিজ্ঞানের সংজ্ঞাবাচক শব্দ বা শব্দগোষ্ঠীর পারিভাষিক অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রকৃতি বিচার করে তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের নাম অণু (atom) এবং মৌলিক পদার্থের বিভাজনে সৃষ্টি হয় পরমাণু এই ধারণাগুলির আস্থিত্বের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ জানালেন। অণুসমূহের পারস্পরিক অবস্থানে সৃষ্টি হয় পদার্থের ভৌতিক গঠন, অণু ও পদার্থের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন। এই ধারণাগুলি যে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানেও উপস্থিত এই তথ্যটির উৎসের সন্ধান ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় পাওয়া গেল। অণুর গতি সম্পর্কিত তত্ত্বও (concept of molecular motion) যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বর্তমান, এটিও তিনি দেখালেন। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও যে অণু-পরমাণু সংক্রান্ত তত্ত্বাদি আছে এটি, ব্রজেন্দ্রনাথের যুক্তিতে, প্রমাণ করে যে এই বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধারণাগুলি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল দীর্ঘকাল ধরে। প্রাচীন হিন্দু আণবিক তত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদ, যাঁর জীবিতকাল ঠিক কখন ছিল জানা যায় না, আন্দাজ করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। তাঁর নামটির আক্ষরিক অর্থ অণু-ভক্ষক। আন্দাজ করা হয় এর কারণ তিনি কেবলমাত্র শস্যকণা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতেন।

গণিতশাস্ত্র ও অস্থিবিদ্যার আলোচনা তিনি এখানে কেন করছেন না সেটির কারণ হিসেবে তিনি জানালেন যে ভারতীয় গণিতচর্চার গবেষণা-ভিত্তিক উপস্থাপনা হেন্‌রি কোলব্রুক করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু অংশে, যেমন বীজগণিতে, কোলব্রুকের কাজটি সমৃদ্ধতর করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর অস্থিবিদ্যা চর্চায় প্রাচীন ভারতের অবদান সম্বলিত গবেষণা ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন ব্রিটিশ-জার্মান বিজ্ঞানী রুডল্‌ফ হের্ণ্‌ল (১৮৪১- ১৯১৮)।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চিন্তা কি ছিল তার সন্ধ্যান পাওয়া যায় সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে। ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় জানা গেল যে শক্তির সঞ্চয়, রূপান্তর ও ক্ষয়ের (conservation, transformation and dissipation of energy) প্রাকৃতিক নিয়মেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিবর্তন ঘটেছিল বলে মত দিয়েছে সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন। এই ধারণাটি বস্তুবাদী বিজ্ঞান-প্রসূত, পরাভৌতিক অনুমান নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিজ্ঞান-সম্মত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে প্রাচীন বলা যায়।

এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাত্ত্বিক তথ্যাদি অবশ্যই প্রাচীন ভারতের উন্নত চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তার কোন অবদানের প্রসঙ্গটি ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। ওষধি-ভিত্তিক চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসায় রসায়ন ও শারীরবিদ্যার তাত্ত্বিক ধারণাগুলির ব্যাপক প্রয়োগের কথাও ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। বৈদিক আমল (১৫০০–৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) থেকেই চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের সারবস্তু সম্বলিত 'আয়ুর্বেদ' ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ এবং কল্পজগতের অব্যর্থ চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত নামটি ধন্বন্তরি। পরবর্তী কালের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত দুটি নাম হল চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাজগতের দুই স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ। এঁরা ঠিক কখন জীবিত ছিলেন জানা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ আন্দাজ করেছেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে হবে না। আর ভেষজ-ভিত্তিক ওষধির যে ব্যপক ব্যাবহার ছিল তার মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজনে মানুষকে অচেতন করার ওষধির ব্যাবহারও জানা ছিল। চিকিৎসা ও শল্য বিদ্যার এই জ্ঞানভান্ডার চরক ও সুশ্রুতের হাতে হয়ত উন্নততর হয়েছে, তাদের অস্তিত্ব কিন্তু আরও প্রাচীন কাল থেকে, ব্রজেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন।

এরপর আসা যাক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনায়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরিক্ষার ফলে লব্ধ জ্ঞান গ্রহণযোগ্য তখনই হয় যখন তারা যুক্তি-সম্মত বলে স্বীকৃতি পায়। ভারতীয় সংস্কৃতির যে যুক্তিবাদী ঐতিহ্য সেটির প্রধান উৎস ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে; ন্যায় শব্দটির অর্থই নীতি, ইংরেজিতে rule। পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার আদিপুরুষ বলে মনে করা হয় গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী)। তারপর 'ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের' যুগে (সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু) ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) অবদানে এটি আরও পরিশীলিত হয়। ঊনিশ শতকে ইংল্যান্ডে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) লিখলেন *'A System of Logic' (১৮৪৩)* নামের একটি বই। *এই* বইটিতে প্রস্তাবনা-ভিত্তিক যুক্তিবাদের (inductive logic) যে পাঁচটি নীতির আলোচনা আছে তাদের প্রয়োগের মাধ্যমে কোন প্রস্তাবের বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য নির্ভুলভাবে যাচাই করা যায়, এইটিই সাম্প্রতিক প্রাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দাবী। ব্রজেন্দ্রনাথ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সহ প্রাচীন

ভারতের যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের সবিস্তার ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন যে এর প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াসমূহ মিলসাহেবের প্রস্তাবনাগুলির তুলনায় উন্নততর এবং এদের ব্যবহারিক প্রয়োগের সীমাও বিস্তৃততর, যেমন ব্যকরণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই রীতিগুলি প্রযোজ্য। ভারতীয় বস্তুবাদী বিজ্ঞানচিন্তা যে যুক্তিভিত্তিক, কল্পনা বা অনুমান-ভিত্তিক নয়, এই ব্যাপারটি যুক্তি-প্রমাণ সহ বিদ্বজ্জনের নজরে আনা ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার অন্যতম সার্থক ফসল।

বিজ্ঞান চর্চায় তত্ত্বপদ্ধতির উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুরা গ্রীকদের সমকক্ষ ছিল এই বিশ্বাসটি যে অবাস্তব নয় প্রফুল্ল চন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথের এই গবেষণা-পুস্তকগুলি তার যুক্তি-ভিত্তিক সাক্ষ্য বহন করছে। এই গবেষণাগুলি প্রকাশিত হবার পর এক শ' বছরেরও বেশী সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এদের ভিত্তি দুর্বল বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন মতবাদ শোনা যায় নি। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয়বহনকারী এই অবদানগুলি তাই কালজয়ী বলা যায়।

বিজ্ঞানের এই সব গভীর তত্ত্বালোচনার সঙ্গে দুটি অপেক্ষাকৃত 'হাল্কা' কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করা যাক। প্রথমটি হল দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের কাজে ক্যালকুলাসের (calculus) কিছু কিছু পদ্ধতির ব্যবহারের আভাস তিনি লক্ষ্য করেছেন। মনে রাখতে হবে যে ইউরোপে ক্যালকুলাসের উদ্ভাবন হয়েছিল ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ও জার্মান বিজ্ঞানী-দার্শনিক গটফ্রিড লাইবনিৎসের (বা লিবনিৎস) (১৬৪৬-১৭১৬) গবেষণার মাধ্যমে, সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই দুই বিজ্ঞানীই তাই ক্যালকুলাসের জনক বলে পরিচিত। গণিতেশাস্ত্রের এই শাখা 'ডিফারেন্সিয়্যাল' ও 'ইন্টিগ্রাল' নামে দুভাগে বিভিক্ত। ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস গাণিতিক সম্পর্কাদির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের হার মাপায় ব্যাবহার হয়। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে গতি পরিমাপের যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছেন তাতে ক্যাল্‌কুলাসের ধারণার ছাপ সুস্পষ্ট বলে ব্রাজেন্দ্রনাথ মত দিয়েছেন। ভাস্কর এই কাজে 'ত্রুতি' নামের একটি সংখ্যা ব্যবহার করেছেন যেটি প্রাচীন হিন্দু গণনা পদ্ধতিতে এক সেকেন্ড সময়ের চৌত্রিশহাজারতম ভগ্নাংশ, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি পরিমাপ। এ ছাড়া তিনি গতি পরিবর্তনের হার হিসেব করার ব্যাপারে স্থুল-গতি ও সুক্ষ্ম-গতি নামে দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে দ্বিতীয়টি ব্রজেন্দ্রনাথের বিচারে নিউটনের ক্যালকুলাসের 'infinitesimal' ধারণার আদি ছায়া। ভাস্করের রচিত 'সিদ্ধান্ত-শিরোমনি' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন গণিত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী (১৮২১-১৯৯০)। শাস্ত্রীজি দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় ভাস্কর তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজে 'তাৎক্ষণিক গতির' ধারণাটি ব্যাবহার করেছেন যেটি ক্যালকুলাসের 'instantaneous motion' নামে প্রচলিত। কিন্তু নিউটন বা লাইবনিৎসের ক্যালকুলাসের অতি মূল্যবান দুটি ধারণার অস্তিত্ব ভাস্করের কাজে খুঁজে পাওয়া গেলেও তা যে দুর্বল তার প্রতিও ব্রজেন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অবহেলা করেননি। সে ধারণা দু'টি হল 'limit' ও 'infinitesimality' যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'সীমা' এবং 'অতি-সুক্ষ্ম' পরিমাপ। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই ধারণাগুলি যদিও মূল্যবান, এদের ব্যবহার কিন্তু ক্যালকুলাসের প্রথম পর্বে ছিল না এবং ধারণা হিসেবে এগুলি ক্যালকুলাস শাস্ত্রে অপরিহার্য্যও নয়। তিনি তাই 'আদি-ক্যালকুলাসের জনক এবং নিউটন-লাইবনিৎসের পূর্বসূরী হিসেবে দ্বিতীয় ভাস্করের দাবী আগ্রাহ্য করতে চান নি।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি ব্রজেন্দ্রনাথ 'হাল্কাভাবে' উল্লেখ করেছেন সেটি হ'ল সংখ্যা গণনার প্রচলিত পদ্ধতিতে হিন্দুসভ্যতার মৌলিক অবদান। গণিতশাস্ত্রে, বিশেষত সংখ্যা-ভিত্তিক বিদ্যাগুলিতে, ভারতীয়দের একটি 'স্বাভাবিক দক্ষতা' আছে বলে বহির্বিশ্বে অনেকে মনে করে থাকেন। যেমন একটি উক্তি যেটি স্বয়ং এ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মুখ-নিসৃত বলে মনে করা হয় সেটি হল, "কি ভাবে সংখ্যা গণনা করা যায় তা আমরা ভারতীয়দের কাছ থেকে শিখেছি এবং এই জ্ঞানটি ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হত না।" সংখ্যা গণনার যে পদ্ধতিটি 'হিন্দু-আরব' পদ্ধতি নামে পরিচিত সেটি হল এক থেকে নয় এবং শূন্য মিলিয়ে দশটি মাত্র সংখ্যা ব্যবহার করে অন্তহীন গণনা করার পদ্ধতি। এটি সম্ভব হয়েছে একটি অতি সহজ কিন্তু মূল্যবান নিয়মের মাধ্যমে। একটি সংখ্যার যেমন একটি 'নিজস্ব মুল্য' (intrinsic value) আছে তেমনি তার একটি 'অবস্থানগত মূল্যও' (position value) আছে। অপর দিকে শূন্য যার নিজস্ব মূল্য কিছু না থাকলেও অন্য সংখ্যার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে তাতে মূল্য আরোপ করে। আর এই পদ্ধতিটিতে ব্যবহারিত পূর্ণ সংখ্যাগুলির অংশবিশেষকে ভগ্নাংশ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব এবং ভগ্নাংশকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় যার 'ভিত্তি'-সংখ্যা (base) হ'ল দশ। এই বিষয়টির নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যার শেষে ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিলেন যে যখন ব্যাস-ভাষ্য রচিত হয়েছিল তখনও দশমিক পদ্ধতি এবং দশমিক-সূচক চিহ্নটির ব্যাবহার হিন্দু সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। আরব, সীরিয় বা গ্রীকদের লেখায় দশমিক চিহ্নটির ব্যবহার দেখা

যায় তার বহু শতাব্দী পরে। বিজ্ঞানের, বিশেষত গণিতশাস্ত্রের, বিবর্তনে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অবদান যে অত্যন্ত মূল্যবান ও উচ্চমানের এইটিই ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রয়োজনীয় উপাদান ও উদাহরণের সাহায্যে তিনি সেটি প্রমাণ করলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র দু'জনেই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা এবং অনুসন্ধিৎসায় যে হঠাৎ ছেদ পড়ে যায় এটি লক্ষ্য করে তার কারণ খুঁজেছেন। প্রফুল্ল চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "হিন্দু সভ্যতার গত হাজার বছর যেন কেটেছে অহিফেন সেবনে জড়তাগ্রস্ত মাতালের মত।"

পরিসংখ্যান বিদ্যা

পরিসংখ্যান বা রাশিবিজ্ঞান বা স্ট্যাটিস্টিক্স বিদ্যাটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যবিষয় হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি পড়াতে শুরু করে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে স্ট্যাটিস্টিক্সের পঠন-পাঠন শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সের চর্চা ও অনুশীলন চালু হয়েছিল সাংগঠনিক ব্যবস্থার বাইরে একজন কৃতী বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিট্যুট (ISI) নামে একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা চালু করেন, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রশান্ত চন্দ্র যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁর এক শিক্ষক তাঁকে 'বায়োমেট্রিকা' নামের একটি গবেষণা-ভিত্তিক জার্নালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বায়োমেট্রি বিষয়টি মানুষের দৈহিক ও আচার-ব্যবহারজনিত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপ করার পদ্ধতির পঠনপাঠন। ফিজিক্সের ছাত্র হিসেবে প্রশান্ত চন্দ্রের গণিতে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই বায়োমেট্রির গাণিতিক ব্যাপারগুলি তাঁর দৃষ্টি এতটাই আকর্ষণ করল যে তিনি এই জার্নালটির সম্পুর্ণ একটি সেট কিনে ফেললেন এবং দেশে নিয়ে এলেন সময়মত পড়ে দেখার জন্য। এটি ছিল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতিসত্ত্বা সম্মেলনে যোগদান করে একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি-উপজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি তুলনা করার জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতির গুরুত্বের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় যে ভাবে উল্লেখ করেছিলেন তাতে বোঝা যায় যে বায়োমেট্রির অন্তর্ভূক্ত মাপজোকের তত্ত্বগুলির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

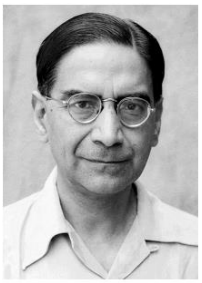
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ব্রজেন্দ্রনাথ ও প্রশান্ত চন্দ্র পরস্পরকে ব্যাক্তিগত ও পেশাগতভাবে চিনতেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রজেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থাদির অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রশান্ত চন্দ্রকে ভার দিলেন পরিসংখ্যান বিদ্যার যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরীক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার। কি কি বিষয় অনুসন্ধান করতে হবে এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের কি কি পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেগুলিও তিনি লিখিতভাবে প্রশান্ত চন্দ্রকে জানালেন। এই কমিটির কাজটি নানা কারণে আর এগোয় নি। কিন্তু প্রশান্ত চন্দ্রের পরিসংখ্যান শিক্ষা যে ব্রজেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে উপকৃত হয়েছিল সে কথা তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রশান্ত চন্দ্র নিজে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিসংখ্যানবিদ। ব্রজেন্দ্রনাথের লন্ডন কংগ্রেসে প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলির কথা উল্লেখ করে প্রশান্ত চন্দ্র লিখলেন যে তাঁর নিজের পরিসংখ্যান বিদ্যার হাতেখড়ি ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে, বিশেষত এই বিদ্যার যুক্তিভিত্তিক দিকগুলিতে। পরিসংখ্যান তত্ত্বে যে অবদানটির জন্য প্রশান্ত চন্দ্র বিশেষভাবে পরিচিত সেটির নাম "মহলানবিশ দূরত্ব" (Mahalanobis distance)। এই তত্ত্বটিতে যে গাণিতিক যুক্তি মহলানবিশ প্রয়োগ করেছেন সেটির অঙ্কুরও ব্রজেন্দ্রনাথের 'জাতিসত্ত্বা' বক্তৃতায় পাওয়া যায় বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভারত স্বাধীন হবার পর প্রশান্ত চন্দ্রের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিট্যুট একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদন পায় এবং শুধু ভারতেই নয় বিশ্বসভায় পরিসংখ্যান শিক্ষা ও গবেষণার একটি উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান পায়। প্রশান্ত চন্দ্রের গবেষণা নৃ-তত্ত্ব, আবহাওয়া, চাষবাস ও ফসল সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে মৌলিক অবদান রেখেছে। তাঁর গুরুস্থানীয় ব্রজেন্দ্রনাথের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণসাধন।

রাজনীতি ও সমাজবিদ্যা

পরিসংখ্যান বিদ্যায় যেমন প্রশান্ত চন্দ্র ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য সমাজবিজ্ঞানে যদি তেমন কোন তরুণের নাম করতে হয় ত তিনি হবেন বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)। বিনয় কুমারকে বলা হয় ভারতে 'সোসিওলজি' বা সমাজবিজ্ঞানের উদ্গাতাদের একজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন, রাজনীতিবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান যেহেতু তখনও আলাদাভাবে পড়ানো শুরু হয় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'Postive Sciences' বইটি নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি করছেন তখন বিনয় কুমার তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন যাতে ব্রজেন্দ্রানাথ এই দুরূহ কাজটিতে অবাধে মনোনিবেশ করতে পারেন। তিনি এই বইটির প্রকাশনার ব্যাপারেও সহায়ক হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি 'positivism' বা বস্তুবাদ ধারণাটি আত্মগত করলেন এবং সমাজবিজ্ঞানে এটি প্রয়োগ করে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে প্রাচীন ভারতের সমাজচিন্তায় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বা সমাজব্যবস্থায় এই ধারণাটির প্রয়োগ ছিল। এই ধারণাটি যে পাশ্চাত্য সভত্যার অবদান, প্রচলিত এই মতবাদটি তিনি যুক্তি-প্রমাণ সহ বাতিল করলেন।

সমাজবিজ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তা বা অবদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর নানা লেখায়, বক্তৃতায় বা বিভিন্ন কমিটিতে দেওয়া মৌখিক বা লিখিত দলিলগুলিতে। যে একটি গবেষণাভিত্তিক রচনায় এই বিষয়গুলিতে তাঁর দখল ও নিজস্ব চিন্তার সুপষ্ট ছাপ মেলে সেটি হল তাঁর লন্ডন কংগ্রেসের বক্তৃতাটিতে। এটিতে তিনি বংশ, উপজাতি, জাতি, দল (family, tribe, race, clan) ইত্যাদি ধারণাগুলির আলোচনা করেন। তারপর নৃতত্ত্বের প্রচলিত বিভাজন প্রথাগুলির (যেমন ভৌত বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, physical or cultural anthropology) সমালোচনা করে প্রস্তাব করলেন জাতিসত্ত্বার একটি 'সমন্বয়ী' ধারণার (synthetic view of race)। তিনি বললেন যে এই সমন্বয়ী ধারণাটিতে জাতিসত্ত্বাকে একটি স্থাবর জৈব ধারণা (static biological idea) হিসেবে বিবেচনা না করে এটিকে একটি সমাজভিত্তিক গতিশীল ধারণা হিসেবে দেখা বেশী যুক্তিসম্মত। সামাজিক জীবন যে পরিবর্তনের মধ্যেও বেঁচে থাকে এবং ব্যক্তি ও জাতিসত্ত্বাকে বহন করে চলে এটার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাই একটি 'সমাজভিত্তিক ব্যক্তিত্বের' ধারণা তাঁর চিন্তায় অর্থবহ। এ ছাড়া তিনি gene অর্থাৎ বংশানুগতির নিয়ন্ত্রক উপাদানের কথাও উত্থাপন এমন একটা সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদ মনুষ্যজাতিকে গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে উচ্চ এবং নিম্নমানে বিভক্ত করছে। মনুষ্যজাতির উৎপত্তি একই জিন না একাধিক থেকে এই ব্যাপারটি বিতর্ক সৃষ্টি করছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধারণাগুলির সঙ্গে শুধু যে পরিচিতই ছিলেন তাই নয়, কি ভাবে যুক্তি বা বুদ্ধির মাধ্যমে এদের খণ্ডানো বা বদলানো যায় তার কথাও চিন্তা করেছেন। হেলেন টিলি নামের লন্ডন জাতিসত্ত্বা কংগ্রেসের একজন আলোচক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই বিশাল সমাবেশে ব্রজেন্দ্রনাথই একমাত্র গবেষক যিনি genetics এর বিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলির অবতারণা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক উপস্থাপনা তিনি শেষ করেন জাতি বা নেশনের প্রসঙ্গে আলোচনা করে। তিনি বললেন যে রাষ্ট্র (nation state) বলতে যে জনসমষ্ঠি বোঝায় তার অস্তিত্ব নির্ভর করে তার সদস্যদের সঙ্ঘবদ্ধ অনুমোদনে যেটা প্রকাশ্যভাবে হতে পারে, যেমন নিয়মিত নিবার্চন ইত্যাদির দ্বারা, অথবা শুধু রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব স্বেচ্ছায় বজায় রেখে চলার মাধ্যমে। তবে নেশন-স্টেটও ব্রজেন্দ্রানাথের মতে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, বিবর্তনের পথে একটি স্তর বা ধাপ মাত্র। মনুষ্যজাতি তার অগ্রগতির চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে বিশ্বমানবতা অর্জন করবে আদর্শবাদী দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের এই ছিল উচ্চাশা।

জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ

পণ্ডিত, অধ্যাপক এবং দক্ষ প্রশাসক হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া। তাঁর এই খ্যাতি এবং সহজগম্যতার জন্য জনসভা-সমিতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিভিন্ন কমিটির সভ্য হওয়া ও সেগুলির নেতৃত্ব দেওয়া এবং পত্র-পত্রিকায় মনীষীদের জীবনীসমেত বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করা এবং মতপ্রকাশের জন্য তাঁর চাহিদা ছিল তুঙ্গে এবং এগুলির জন্য তিনি প্রচুর আমন্ত্রণ পেতেন। যদিও তিনি আদতে একজন লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তবু বিভিন্ন পদাধিকারবলে অন্যদের সাথে তাঁর বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের তথ্যসূত্রে জানা যায় যে তাঁর বন্ধুবর্গ এবং পরিচিতজনের পরিসরটি ছিল বিস্তৃত। তাঁর লেখা জীবনচরিতগুলি থেকে তিনটিকে বেছে নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব। এই তিনটি বাছা হয়েছে মনীষীদের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের জন্য নয় (তাঁরা সকলেই স্বনামধন্য), ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা তাঁদের জীবনচরিতের সহজলভ্যতার জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৮০-র দশকের প্রথমদিকে ব্রজেন এবং নরেন (ভবিষ্যতের স্বানীজি) ছিলেন কলেজে সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বামীজির শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতাও ব্রজেন্দ্রনাথকে ভালভাবে চিনতেন এবং তাঁদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার অনুরোধেই ব্রজেন্দ্রনাথ স্বামীজির স্মরণে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেটি রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা *প্রবুদ্ধ ভারতে* প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ছিল এপ্রিল, ১৯০৭।

স্বামী বিবেকানন্দ

এই প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে বর্ণনা করেছেন একজন প্রতিভাবান, মিশুক, স্বাধীনচেতা, সুগায়ক, উজ্জ্বল আলাপচারী (তবে সময় সময় একটু তিক্ত) এবং বোহেমিয়ান (ভবঘুরে) যুবক হিসাবে। তবে তিনি ছিলেন লৌহ-কঠিন প্রত্যয়-সম্পন্ন, যে গুণটি বোহেমিয়ানদের সচরাচর থাকে না। ব্রজেন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য করেছেন যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে অস্থির। তিনি চেষ্টা করতেন যুক্তি এবং প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণের সূত্রে তাঁর ছেলেমানুষী ভগবৎ বিশ্বাস এবং সহজ প্রত্যাশার বোঝাপড়া করতে। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে চরম সত্যে উপনীত হওয়ার নিশ্চয়তার ব্যাপারে তাঁর পীড়াদায়ক সন্দেহ এবং হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে পড়ার জন্য কিছু বইপত্র দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ইংরেজ কবি শেলীর 'Hymn to the spirit of intellectual beauty' কবিতাটি ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন শেলীর সহস্রাব্দের গৌরাবান্বিত মানবিকতার উজ্জ্বল চিত্রপট নরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল, যা দার্শনিকদের যুক্তিতর্ক করতে পারেনি। ব্রজেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন যে সেইসময় তিনি নিজের মনেও কি করে বেদান্তের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ এবং ফরাসি বিপ্লবের মুক্তি, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের বাণীর সমন্বয় করা যায় তার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। শেলী যে একাত্মের ধারণা করেছিলেন তার থেকে উচ্চতর এবং মহান বিশ্বজনীন যুক্তি হিসাবে *পরব্রহ্মণের* কথা ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও যুক্তি দিয়ে আবেগ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তিনি আকাঙ্খা করছিলেন রক্ত-মাংসে গড়া গৌরবের কোন এক মূর্ত প্রতীককে, যা তাঁকে উত্তোলন করতে পারবে, রক্ষা করতে পারবে, যে শক্তি গুরু এবং পথ-প্রদর্শক হিসাবে তাঁর অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে পারবে।

নরেন্দ্রনাথের এইরকম অশান্ত মানসিক অবস্থাকে যাতে কেউ প্রশমিত করতে পারে তার আধ্যাত্মিক উপায় অনুসন্ধানে দুই বন্ধুতে এক গ্রীষ্মের বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গেলেন। খুব সম্ভবতঃ সেটা ছিল ১৮৮২ সাল। ব্রজেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের খ্যাতির সুবাদে তাঁকে জেনেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে আগে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং কালী-আরাধনার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তিনি লিখেছিলেন, "আমার মনে হয়েছিল তা ছিল একটা অমার্জিত, অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়বাদ, যা আমার যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার কাছে ছিল একটি অবোধ্য প্রহেলিকা।" আধ্যাত্মিক নিশ্চয়তার জন্য নরেন্দ্রনাথের এই তীব্র আকাঙ্খা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে অক্ষমতা বলেই মনে হয়েছিল।

পরমহংসের সাথে নরেনের এটা অবশ্য প্রথম সাক্ষাৎ ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮১-র নভেম্বর মাসে উত্তর কলকাতার তৎকালীন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুরেশ মিত্রের বাড়িতে। সুরেশবাবুর বাড়ি নরেনদের সিমলার বাড়ির কাছাকাছিই ছিল। গৃহকর্তার অনুরোধে সেই জমায়েতে নরেন গান গেয়েছিলেন। যতদূর জানা যায় রামকৃষ্ণ নরেনের সঙ্গীত-প্রতিভার প্রসংশা করেছিলেন এবং তাকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে সেই নিদাঘ-অপরাহ্নের বেশীরভাগ সময়টাই তাঁরা মন্দির-সংলগ্ন, ছায়াঘন, শান্ত-নিঃশব্দ উদ্যানে অতিবাহিত করেন। তারপর খানিকটা হতবুদ্ধি অবস্থায় ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতের মধ্যে এই উপলব্ধি নিয়ে ফিরে আসেন যে ভগবদবিশ্বাস হল আত্মোপলব্ধির সহায়ক একটি বহির্শক্তি। রামকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎকার নরেন্দ্রনাথের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়, যদিও তা তাৎক্ষণিক ছিল না। তবে রামকৃষ্ণের নির্দেশ এবং উপদেশগুলিতে এবং তাঁর আবেগতাড়িত ব্যবহারে নরেনের সন্দেহ থেকেই যায়। একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথই এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, যার বিশেষ মূল্য আছে। দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের আগে এবং পরে নরেনের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গভীর আগ্রহ সহকারে আমার চোখের সামনে আমি নরেনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।" সেদিনের দর্শনেই যে নরেন্দ্রনাথ

পুরো বদলে গিয়েছিলেন তা নয়। তবে সেই সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণ এবং ভক্তিপথে তাঁর জীবনযাত্রা সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ অনেক বাড়িয়ে দেয়। এ কথা অনেক সমকালীন লেখকই লিখে গেছেন। রামকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং গুরু হিসাবে বরণ করে নেবার আগে নরেন্দ্রনাথ অস্থিরচিত্ততায় দুলছিলেন। স্মৃতিচারণায় ব্রজেন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণটি প্রণিধানযোগ্য। গুরুর আশীর্বাদধন্য এবং তাঁর শক্তিতে বলবান হয়ে বিবেকানন্দ বিশ্বমানবতা, আত্মার অবিচ্ছেদ্যতা এবং সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার করেন।

কলেজের দিনগুলোর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ ছিলেন দুই ভিন্ন পথের পথিক। তবে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, যদিও মতামত আদান-প্রদানের কোন প্রামাণ্য নথি নেই। যা আছে তা হল যাঁরা দুজনেরই বন্ধু বা পরিচিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের লিখিত বর্ণনা। এ রকম এক বর্ণনায় জানা যায় যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে ভাই মহেন্দ্রনাথকে ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি সমাজসেবার পরিকল্পনার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ধুর অনুরোধে পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার আগেই স্বামীজি দেহরক্ষা করেন।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়

বহুভাবেই ব্রজেন্দ্রনাথ এবং রামমোহন ছিলেন সমমানসিকতার মানুষ। উভয়েই ছিলেন বহুবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত, বিশ্বমানবতা এবং সর্বধর্মসমন্বয়ে বিশ্বাসী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহনের জীবন এবং ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে তাঁর অবদানের উপর অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত রামমোহনের প্রয়াণবার্ষিকী সভায় বক্তৃতা দিতে ব্রজেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। সচরাচর এই ধরণের স্মরণসভায় বক্তৃতা এবং তার বিষয়বস্তু গৌণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সভাটি একটি সামাজিক মেলামেশার মঞ্চে পরিণত হয়। কিন্তু যখন ব্রজেন্দ্রনাথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বক্তা, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়। আগে থেকে প্রস্তুত করা এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহনের জীবন, তাঁর বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা ও সাফল্য এবং ভারতের নবজাগরণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা বর্ণনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি যেভাবে রামমোহনকে দেখেছেন তা হল, "রামমোহনই ছিলেন আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ এবং জনক, হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে উদ্গত এক বিশ্বধর্মের প্রবক্তা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলি একই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও তাদের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট সেগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।" ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে রামমোহন উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র সমেত সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁর নিজের ধর্ম এবং জীবনদর্শন শঙ্করের উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং গীতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

ইসলাম ধর্মের যুক্তিবাদী এবং ধর্মসমন্বয় সাধনকারীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রামমোহন সচেষ্ট হন। এবিষয়ে তিনি দুটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এদের একটি ছিল আরবী ভাষার ভূমিকা সমেত ফার্সী ভাষায় লেখা, 'তুফাত-উল-মুয়াহিদিন' অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদকে উপহার', আর অন্যটি ছিল আরবী ভাষায় লেখা 'মাঞ্জারাত-উল এডিয়ান' অর্থাৎ 'বিশ্বধর্ম এবং সামুহিক বিশ্বাস'।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন রামমোহন খ্রীষ্ট এবং ইহুদি ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এগুলি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তিনি হিব্রু, সীরিয় এবং গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে হিব্রু ভাষায় লিখিত ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং গ্রীক ভাষায় লিখিত নিউ টেস্টামেন্ট অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া তিনি তালমুদ, তারজুম এবং র‍্যাবাইদের (ইহুদি পুরোহিতদের) লেখা অন্যান্য পুঁথি পড়ে ইহুদি এবং খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব এবং বিকাশ সন্ধান করেন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব-চর্চা ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনেরও একটি লক্ষ্য ছিল। শুধুমাত্র খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় নয়, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদেরও নিয়ে রামমোহন কলকাতায় সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বধর্মের মূল বিষয়গুলির একীকরণ করে এবং নতুন ভগবদ্ এবং মানব প্রেমে উদবুদ্ধ হয়ে 'নব্য ধর্মদর্শন' নামে তিনি একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি করেন। এই ধারণা রামমোহনেরও জীবনদর্শন ছিল এবং ব্রজেন্দ্রনাথের কথায় এতেই রামমোহন ছিলেন 'বিশ্বমানব'। এই ধারণার মূর্ত প্রতীক ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণ, যাঁর কথায় আমি একটু পরেই আসছি।

রামমোহনের উপর ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যাঙ্গালোরের বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে কলকাতায় রামমোহনের মৃত্যুর শতবর্ষের স্মরণসভায় তাঁর জীবন এবং ভারতেতিহাসে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ এবং পৃথিবীর অন্য অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ আমন্ত্রিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই স্মরণসভায় রামমোহনের সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সহিষ্ণু মানবিক ধর্ম এবং জীবনদর্শনের ধারণার উল্লেখ করেন। এই সভায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তৃতা আলাদা আলাদা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পরমহংস রামকৃষ্ণ

পরমহংস রামকৃষ্ণ

ব্রজেন্দ্রনাথ যে সমস্ত ব্যক্তিদের জীবন এবং ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন, রামকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বর্ষব্যাপী রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন আহ্বায়ক এবং ১৯৩৭এর ১লা মার্চ থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের প্রধান বক্তা। এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছিল 'ধর্মসংসদ'। সেই সময় ব্রজেন্দ্রনাথের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও, সম্ভবত রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ, তিনি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার আগে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর লিখিত বক্তৃতাটি স্বামী অভেদানন্দ পাঠ করেন এবং তিনি সভা পরিচালনা করেন।

সেই বক্তৃতায় ব্রজেন্দ্রনাথ বহু বছর আগে বন্ধু নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেছিলেন। তাতে উল্লেখ ছিল নরেন্দ্রনাথের সাথে রামকৃষ্ণের কথোপকথনে তিনি নিজে কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন এবং ফেরার পথে ঝড়-বৃষ্টি যেন নরেন্দ্রনাথের তৎকালীন অশান্ত মানসিক অবস্থারই পরিচায়ক ছিল। তারপর তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতার সাথে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুভূতির তুলনা করে লেখেন, "আমার জীবন-সায়াহ্নে শান্ত-সমাহিত এই অপরাহ্নে আমি আপনাদের কাছে এমন একজনের স্মৃতিচারণা করে ধন্য, যিনি এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েও ছিলেন দেশ ও কালের ঊর্দ্ধে।"

ব্রজেন্দ্রনাথ আরো বর্ণনা করেন রামকৃষ্ণ নিজের বিখ্যাত উক্তি "যত মত, তত পথ" ব্যক্ত করার আগে কিভাবে দৈনন্দিন আচার-আচরণ সহ বিভিন্ন ধর্ম পালন করতেন। এই ছিল পরমহংসের সর্বধর্মসমন্বয়। সুতরাং রামকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন বিশ্বমানবতাবাদী, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নন। রামকৃষ্ণের কালী-আরাধনা অনেক শিক্ষিত বাঙালী পছন্দ করতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথ যৌবনে ছিলেন সেই দলেই। জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল রামকৃষ্ণ সাকার এবং নিরাকার আরাধনার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর কাছে সাকার-নিরাকারের কোন ভেদ ছিল না, মূর্তি ছিল ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে ধর্মসংসদকে দেখেছিলেন আরো বৃহত্তর মানবসংসদ হিসাবে, মানব কল্যাণে নিয়োজিত স্থবির নয়, একটি সুসংহত চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখা

উপরোক্ত প্রতিবেদনে ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সৃজনশীলতা শুধুমাত্র আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রকাশনাগুলি ছিল গণিত, ইতিহাস, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের উপর যেগুলি বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর বহুমূখী প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মডার্ন রিভিউ ম্যাগাজিনে তাঁর গীতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে গীতা ছিল আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাদায়ী এবং এই ধর্মগ্রন্থের তাঁর কৃত ব্যাখ্যাটি ছিল সমন্বয়ী এবং অভিনব। অন্য ধরণের তাঁর আর একটি বৃহৎ সাহিত্যকর্ম ছিল মহাকাব্যের রীতিতে রচিত কবিতা 'The Quest Eternal'। রূপকধর্মী এই দীর্ঘ কবিতাটির উপজীব্য ছিল মানুষের সত্যসন্ধান। দীর্ঘদিন লেগেছিল কবিতাটি প্রকাশ পেতে। ব্রজেন্দ্রনাথ এটির প্রারম্ভিক অংশটি রচনা করেন তাঁর প্রথম যৌবনে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস দ্বারা সমগ্র কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই কবিতাটিকে টি এস ইলিয়টের বিখ্যাত কবিতা The Waste Land-এর সাথে তুলনা করা হয়। দুটি কবিতাতেই দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বিশ্বজনীনতার দ্বন্দ্বে সত্যসন্ধানীর সংগ্রাম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশাসক, উপদেষ্টা এবং পরামর্শদাতার ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ

কলকাতা পর্যায়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কর্মজীবনের প্রথমদিকে বাংলার কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের উপর অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজ পরিচালনা এবং পুনর্গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, যা তিনি দক্ষতার সঙ্গেই পালন করেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পর্যালোচনার জন্য নিয়োজিত রিভিউ কমিটিতে আমন্ত্রিত হয়ে কমিটির সদস্য হন এবং এর পর সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমেত শিক্ষাসংস্কারের কমিটির সদস্য হন। এর পরের পর্যায়টি ছিল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দশকব্যাপী উপাচার্যের দায়িত্ব পালন এবং সেই সঙ্গে মহীশূর রজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে পরামর্শ দান।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত উপাচার্য শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম নবনির্মাণে পরামর্শদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। তাঁর তৎকালীন কর্মস্থল কোচবিহার থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথ সদস্য হিসাবে এই কমিটির আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের নবনির্মাণে এই কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্রিটিশ কর্তৃক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ভারতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ প্রশাসকরা কয়েক বছর ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করছিলেন। কিন্তু তাতে পরিচালনা এবং শিক্ষাদানে বড় কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ভারত সরকার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার, বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলি খতিয়ে দেখে তার সমাধানের উপায় নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। প্রতিথযশা ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ এবং ইংল্যান্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল আর্নেস্ট স্যাডলার এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। আরো ছয় জন শিক্ষাবিদ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন ভারতীয়। তাঁরা হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আলীগড়ের গণিত-বিশারদ জিয়াউদ্দীন আহমদ।

স্যাডলার কমিশন সতের মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন এবং তাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে তেরো খণ্ডে তার রিপোর্ট জমা দেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কমিশন ব্রজেন্দ্রনাথ সমেত আরো অনেক শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানায় এই রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশ নিতে এবং নিজ নিজ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলিতে অবদান রাখতে। স্যাডলারের বক্তব্য অনুযায়ী পরিমানগতভাবে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান ছিল বিরাট এবং গুণগতভাবে তা ছিল উৎকৃষ্ট মানের।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ এবং গুণগ্রাহীরা কলকাতায় তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে ইংল্যান্ড থেকে স্যাডলার একটি বাণী পাঠান, যাতে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে 'আমার গুরু' বলে অভিহিত করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে স্যাডলার ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "রিপোর্টের বিভিন্ন খণ্ডে, বিশেষত সপ্তম, নবম, দশম এবং দ্বাদশ খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনি-নিঃসৃত বক্তব্যগুলি চিরস্থায়ীভাবে মূল্যবান হয়ে থাকবে এবং আমি আশা করি তাঁর কাজকর্মের পরিচায়ক হিসাবে অন্তত আংশিকভাবে হলেও পুনর্মুদ্রিত হবে।" স্যাডলার এই আশাও ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতের কোন ঐতিহাসিক এই রিপোর্ট পাঠ করতে গিয়ে কমিশনের প্রশ্নমালার ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদত্ত উত্তরগুলিতে বিশেষ আগ্রহ সহকারে আকৃষ্ট হবেন।

স্যাডলার ব্রজেন্দ্রনাথের মৌখিক এবং লিখিত ইংরাজী ভাষায় দক্ষতার প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, "ব্রজেন্দ্রনাথের ইংরাজী লেখার একটি নিজস্ব ভঙ্গী ছিল, যা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন। তাঁর লেখা বিশেষ বিশেষ বাক্যগুলি পড়লেই মনে হ'ত এগুলি অবশ্যই ডঃ শীলের লেখা। ডঃ শীল ছাড়া অন্য কেউ এভাবে লিখতে পারত না। শব্দচয়ন এবং বাক্যবিন্যাস ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রামাণিক নিদর্শন।"

মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথ - বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার, রাজ্য ও মহারাজার পরামর্শদাতা এবং জনসংযোজক

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কিছুদিন ইতঃস্তত করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি গ্রহণ করতে সম্মত হন। এতে একজন চিন্তাবিদ-দার্শনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত নতুন প্রতিষ্ঠানের

প্রশাসকে পরিণত হলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মহীশূর পৌঁছান। পরবর্তী এক দশক ছিল তাঁর কর্মজীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং ফলপ্রসূ সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহীশূরের রাজপরিবার এবং রাজ্যের জনগণও এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খুবই উচ্চাশা পোষণ করতেন। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য যথোপযুক্ত সম্পদের সংস্থান ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন সম্পর্কে অবহিত হলেন। উপাচার্য পদে যোগদানের ঠিক একবছর পরেই ১৯২১এর ডিসেম্বর মাসে অন্তরঙ্গ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি ব্যক্তিগত পত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা এবং তাঁর হতাশার কথা জানান। তিনি অনুশোচনা করেন যে নতুন কোন উদ্যোগ নেওয়া তো দূরের কথা, অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোও দুরূহ হয়ে উঠছে।

এই আর্থিক অনটন সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথের উৎকর্ষের প্রতি নিষ্ঠা অটুট ছিল। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে মহীশূরের মহারাজা শ্রী জয় চামারাজা ওয়াদিয়ার ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে বলেন যে, "মহীশূরের মাটিতে পদার্পণ করার মুহূর্ত্ত থেকেই ডঃ শীল বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং সাধারণভাবে মহীশূরের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ যত বেশী বেশী করে মহীশূর এবং তার জনগণকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন তত বেশী বেশী করে তাদের ভালবেসে ছিলেন।" এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন ছিল না, তা তাঁর হৃদয়কেও মথিত করেছিল। এরপর প্রশংসাকারী মহারাজা বর্ণনা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে মহীশূরকে বুঝেছিলেন এবং ভালবেসে ফেলেছিলেন। এক বিদ্বজ্জন সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদত্ত বক্তৃতার একটি অংশ মহারাজা উদ্ধৃত করেন, "ভারতের জনগণ এবং তাঁদের সংস্কৃতির মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের প্রভেদের যে সমস্যা আছে, মহীশূরের ভাষা এবং সাহিত্য, কলা এবং ঐতিহ্য, জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র এবং রাজপরিবারের ইতিহাস তা সমাধান করেছে অথবা সমাধান করতে চেষ্টা করেছে।"

ব্রজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটির রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার গঠনতন্ত্রে বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। তার একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাকস্নাতক স্তরে কতকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ব্রজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষার এই প্রসার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তিনি বিভিন্ন কলেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের কর্মকর্তাদের উৎকর্ষের জন্য উৎসাহ দিতেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য এবং উপযুক্ত কর্মকাণ্ডে তাঁর সহযোগিতা করার মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হয়ে মহারাজা রাজ্যের প্রশাসনিক, সাংবিধানিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে ব্রজেন্দ্রনাথকে একজন পারিষদ হিসাবে নির্বাচিত করেন। বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৯২৫ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন এবং মহীশূর আইন পরিষদের সংবিধান সংশোধনের উপর, ১৯২৬ সালে মহীশূর অর্থনৈতিক সম্মেলনে এবং ১৯২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা বোর্ডের রিপোর্টের উপর আলোচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ ভাষণ দেন। এগুলি থেকে জানা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মে এবং তার উন্নয়নের উপর ব্রজেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিখ্যাত কানাড়া কবি, পণ্ডিত এবং ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রী বি এম শ্রীকান্তিয়াকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কানাড়া ভাষার পাঠক্রম প্রস্তুতিতে উৎসাহ দেন। এটি অধ্যাপক শ্রীকান্তিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যাপিকা শ্রীমতি রাজেশ্বরী চ্যাটার্জী লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের উচ্চতর পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরী করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাঁর প্রদত্ত প্রথম ভাষণটি একটি ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে। সমাবর্তনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ব্রজেন্দ্রনাথের অভিমতগুলির সাথে রবীন্দ্রনাথ সহমত ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমন্ত্রিত হয়ে বেশ কয়েকজন মনীষী মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দেন। তাছাড়া তাঁরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছেও বক্তব্য রাখেন। এই মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর মন্ত্রী পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য, শিক্ষাবোর্ডের উপদেষ্টা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে মহীশূর সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরের কতিপয় ইউরোপীয় বাসিন্দাদের দ্বারা অপ্রথাগত নামের একটি সংস্থা The Mythic Society প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল মহীশূর এবং ভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করা। সংস্থাটি মহীশূর এবং ভারতের খ্যাতনামা মনীষী এবং বক্তাদের দ্বারা সাধারণের বোধগম্য বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করত। ব্রজেন্দ্রনাথ এই সোসাইটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির সভায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাটি সোসাইটির ত্রৈমাসিক জার্নালে প্রকাশিত হয়।

দুটি স্মরণীয় সাক্ষাৎ

এখানে উল্লেখ করা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হবে যে কেমন করে তাঁর দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদ মহাত্মা গান্ধীর সাথে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মারক তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং চরকার বাণী প্রচারের জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৯২৭এর মার্চ-এপ্রিলে মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় তিনি মৃদু পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং সেরে ওঠার জন্য তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। নন্দী হিলসে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে তিনি ব্যাঙ্গালোরে মহারাজার অতিথিশালায় অবস্থান করেন আরো বিশ্রামের জন্য। এই সময় ব্রজেন্দ্রনাথ অল্প কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় কাটিয়ে মহীশূরে ফিরছিলেন। খবর পেয়ে তিনি গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রাবিরতি করে তাঁর সাথে দেখা করলেন। গান্ধীজি তখনও খুব দুর্বল এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। তা সত্ত্বেও এই দুই জাগ্রত চিত্তের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। গান্ধীজি জানতে চান ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাংলার যুবকদের তুলনায় দক্ষিণ ভারতীয় যুবকদের অবস্থান কোথায়। ব্রজেন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ছিল বঙ্গযুবকেরা আবেগপ্রবন এবং কল্পনাবিলাসী, আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ এবং অনেক কিছুর খবর রাখে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতীয় যুবকেরা অনেক বেশী ব্যবহারিক এবং দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। দৃঢ়তা এবং প্রতিরোধ করার সাহস দক্ষিণীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

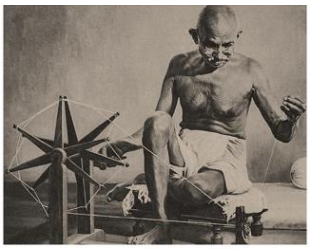
চরকা চর্চায় গান্ধীজি

গান্ধীজি বঙ্গযুবকদের মধ্যে সাহসের যে পরিচয় পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল বঙ্গযুবকদের মধ্যে মৃত্যুবরণের সাহস আছে, কিন্তু তাদের বাঁচার সাহসের অভাব।

গান্ধীজি ব্রজেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তৎকালীন বাংলা দুজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং একজন 'কবি' সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বাংলায় চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির অভাব আছে একথা বলা যাবে না।

ব্রজেন্দ্রনাথের আরো পর্যবেক্ষণ ছিল জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে বাঙ্গালীরা দক্ষিণীদের তুলনায় অনেক কম রক্ষণশীল। তাঁর মতে এটা বাংলায় উদারবাদী বৌদ্ধ সংস্কৃতির ফল। বাংলায় বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। সম্ভবত সেজন্য বাঙ্গালীরা আত্মকেন্দ্রিকও হয়ে ওঠে। তিনি স্বীকার করেন তাঁর নিজের চরিত্রও এই বৈশিষ্ট্যমুক্ত নয়।

খুব সম্ভবত শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য গান্ধীজির মনে মৃত্যু-চিন্তার উদয় হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পরমায়ু আর কত বছরের বলে ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিকসুলভ উত্তর ছিল যিনি আগেই অমরত্ব অর্জন করেছেন বছর দিয়ে তাঁর পরমায়ু পরিমাপ করা গুরুত্বহীন। প্রস্থানের আগে ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রথায় পদস্পর্শ করে গান্ধীজিকে প্রণাম করেন। পাঁচ বছরের ছোট গান্ধীজি এতে অস্বস্তি বোধ করে উঠে বসেন এবং মাথা নত করে ব্রজেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কয়েকজন সঙ্গীসহ রবীন্দ্রনাথ কলম্বো যাচ্ছিলেন ইংল্যান্ডগামী জাহাজ ধরতে। মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাবার পথে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে থামলেন শ্রী অরবিন্দের সাথে দেখা করতে। তারপর কলম্বো পৌঁছে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর যাত্রা বাতিল করতে হল। খবর পেয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর আতিথ্যে ব্যাঙ্গালোরে বিশ্রাম নেবার জন্য। কবি ব্রজেন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছালেন এবং বালাব্রুয়ী নামের ইংরাজী স্থাপত্যে নির্মিত এক বড় অট্টালিকায় অবস্থান করলেন। ইংল্যান্ড যাত্রায় কবির সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ। তিনি কবির সাথে ব্যাঙ্গালোরে রয়ে গেলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় কবির এই অপ্রত্যাশিত সাময়িক অবসরের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। নির্মলকুমারী স্মরণ করেছেন যে অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের

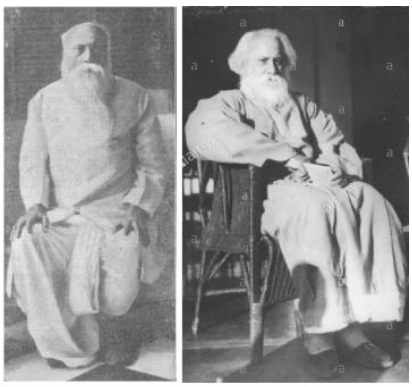

ব্রজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ

সৃজনশীল মন নিষ্ক্রিয় ছিল না। তিনি সেই সময় তাঁর দশম উপন্যাস 'শেষের কবিতা' লিখছিলেন। বালাব্রুয়ীর শান্ত পরিবেশে এবং বন্ধুবর্গের সাহচর্যে তিনি উপন্যাসটি সমাপ্ত করতে মনস্থ করলেন এই ইচ্ছা নিয়ে যে তাঁর লেখার ভক্ত ব্রজেন্দ্রনাথকে এর কিছুটা পড়ে শোনাবেন। নির্মলকুমারীর লেখায় পাওয়া যায় যে এক গভীর রাত্রে তিনি দেখলেন কবি জেগে আছেন এবং ডেস্কে বসে লেখালেখি করছেন। কবিকে শুতে পাঠানোর জন্য তাঁর ঘরের দিকে যেতেই নির্মলকুমারী শুনতে পেলেন যে কবি তাঁর লেখা থেকে আবৃত্তি করছেন এবং বারবার মাথা নেড়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আবার লেখায় মনোনিবেশ করছেন। এই দেখে নির্মলকুমারী কবিকে বিরক্ত না করে পা টিপে নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে কবি খুশী হয়ে ঘোষণা করলেন যে তিনি উপন্যাসটি শেষ করেছেন এবং সেটির নির্বাচিত অংশ আমন্ত্রণকর্তা এবং অন্যান্যদের পড়তে দিলেন। উপন্যাসের একেবারের শেষে কবিতাটির নিচে স্থান এবং তারিখ লেখা ছিল যথাক্রমে বালাব্রুয়ী এবং ২৫শে জুন ১৯২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ উপন্যাসের নির্বাচিত অংশ পড়ার অনুরোধ পেয়ে খুশী হলেন। যেটি দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছিল সেই 'হে বন্ধু বিদায়' কবিতাটি কবি নিজের সুমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন। নির্মলকুমারী এই কবিতার অনেকগুলি শব্দ চিনতে পারলেন যেগুলি তিনি আগের রাত্রে কবিকণ্ঠে শুনেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কবির সেই বয়সেও এরকম লেখার প্রশংসা করলেন। কবির বয়স তখন ৬৭ আর 'শেষের কবিতা' ছিল অল্পবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে একটি রোম্যান্টিক উপন্যাস। কবি এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা পরদিন ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা যাত্রা করলেন।

এর দু'বছর পর ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ব্রজেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে কর্ণধার হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মহীশূরের জনগণের দৃষ্টিতে কতখানি শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন। নথিতে উল্লেখ আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তির দিনগুলি ছিল ভাব-গম্ভীর। একটি প্রশস্তি-পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মাননীয় মহারাজা স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করেন এবং তা তাঁর পরিচিত জনের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। এই প্রশস্তি-পত্রে উল্লেখ ছিল যে ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা-কর্মটি সমাধা করেন। মনে হয় এটি সমাধা করার লক্ষ্যই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেনেট দ্বারা পুনর্গঠনের পরামর্শগুলি গৃহীত হবার পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

পুরস্কার এবং সম্মান

যদিও লাজুক প্রকৃতির মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথ লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকাই পছন্দ করতেন, তবু তাঁর পাণ্ডিত্য এবং চিত্তের উদারতা, যাঁরা তাঁর ব্যস্ত এবং দীর্ঘ জীবনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে তাঁকে প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। বিশেষত তাঁর শেখার প্রবল আগ্রহ এবং শেখা বিষয়গুলি অন্যদের শেখানোর ইচ্ছা তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের অ্যালমা-ম্যাটার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সাম্মানিক 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রী প্রদান করে। ডিগ্রী প্রদানের অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, "...ব্রজেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক সিদ্ধির ব্যাপ্তি ছিল বিশ্বকোষের পরিসরের ন্যায় বিশাল। যদি সংস্কৃতির কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা এড়িয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা অনুসন্ধান করতে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে...।" সেই বছরই শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'নাইটহুড' উপাধি প্রদান করে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ব্রজেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে কবি ব্যাখ্যা করেন যে এতদিন বিশ্বভারতী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের দ্বারাই লালিত-পালিত হয়েছে। এখন তিনি একে ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করছেন। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন এর প্রথম আচার্য হবার জন্য। ব্রজেন্দ্রনাথ সবিনয়ে তাতে সম্মত হন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন তিনি আশা করেন যে বিশ্বভারতী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সচেতনভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং মূল্যবোধের সংরক্ষণ, অনুশীলন করবে এবং প্রসার ঘটাবে। এর কর্মকর্তাদের তিনি বলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মহত্ত্ব জগতের মধ্যে বিতরণ করতে এবং জগতের সম্পদে ভারতকে পুষ্ট করতে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে মহীশূর রাজ্যের এবং রাজ্যবাসীদের কল্যাণে তাঁর দীর্ঘ, বহুমূখী এবং মূল্যবান অবদানের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথকে মহীশূরের মহারাজা 'রাজতন্ত্রপ্রবীণ' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসের একটি পুরো দিন উৎসর্গিত হয় সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা এবং শ্রদ্ধা জানাতে। ব্রজেন্দ্রনাথের ছাত্র, বন্ধুবর্গ এবং সহকর্মীসমেত শহরের বিশিষ্ট নাগরিকেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এজন্য সমবেত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পূর্বতন উপাচার্য ডাঃ নীলরতন সরকার এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু তিনি একটি দীর্ঘ কবিতায় ব্রজেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রশংসা করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা এবং সম্মানের জন্য সমবেত জনগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি অবশ্য দেশে তখন যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মধ্যে সহনশীলতা এবং সহাবস্থানের প্রয়োজনের উপর তিনি জোর দেন এবং তাঁর বন্ধুদের এই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

ব্রজেন্দ্রনাথের খ্যাতি সম্পর্কে অনেকের ব্যক্তিগত উক্তির মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি উক্তি হল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রোর। ব্রজেন্দ্রনাথের এক বক্তৃতা শুনে অধ্যাপক রো মন্তব্য করেন, "ইনি তো সীল নন, ইনি জলহস্তী!"

পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন

পরিবার

তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যাসন্তান রেখে ব্রজেন্দ্রনাথের স্ত্রী কম বয়সে মারা যান। তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়েন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনন এবং নৈতিক দর্শনে স্নাতক হন এবং বোম্বাই-এর এলফিন্সটন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফরাসি এবং তাঁদের দুই পুত্র এবং এক কন্যাসন্তান ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান এবং তাঁদের পুত্র অনিল শীল ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন ঐতিহাসিক। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডে মারা যান। ব্রজেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা সরজূবালাও ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাই বসন্তরঞ্জনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বসন্তরঞ্জন মারা যান। সরজূবালা বাংলা ভাষায় এক প্রতিভাশালীনি লেখিকা ছিলেন এবং তাঁর লেখা বেশ কিছু কবিতা সংকলন এবং নাটক প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে ছিল একটি দীর্ঘ কবিতা 'বসন্ত প্রয়াণ'। এটিতে তাঁর স্বামীর মৃত্যুজনিত গভীর দুঃখ পরিস্ফুট হয়েছে। এটি ইংরাজীতে অনুদিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দেন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর বিপত্নীক ভগ্নীপতি শরৎচন্দ্র সেনের সাথে সরজূবালার পুনর্বিবাহ হয়। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন সরজূবালার পুত্রদের অন্যতম।

ব্যক্তিগত জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ

দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক পরিসরে এই পণ্ডিত মানুষটি কেমন ছিলেন? আগেই বলা হয়েছে যে এডোয়ার্ড টম্পসন এবং মাইকেল স্যাডলার দুজনেই ব্রজেন্দ্রনাথের ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা এবং লেখনশৈলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তবে টম্পসন আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কেতাবি লেখাগুলি ছিল কিছুটা অনমনীয়, ল্যাটিন-ঘেঁসা এবং পড়া কষ্টকর। কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এবং চিঠিপত্রে তাঁর ইংরাজী ছিল পরিস্কার, প্রাঞ্জল এবং উচ্চমানের।

ব্রজেন্দ্রনাথের আর একজন বন্ধু এবং গুণগ্রাহী ছিলেন স্কটিশ জীববিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ এবং নগর-পরিকল্পনাকার প্যাট্রিক গেডেস (১৮৫৪-১৯৩২)। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনীকারও ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধু টম্পসন গেডেসেরও বন্ধু ছিলেন। আলাপচারী ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে থমসন একটি মজার ঘটনা লিখে গেছেন। এক সন্ধ্যায় গেডেসের কলকাতার বাড়িতে তাঁর এক বন্ধু এবং ব্রজেন্দ্রনাথের ডিনারে নিমন্ত্রণ ছিল। যখন ব্রজেন্দ্রনাথ কথাবার্তা শুরু করলেন তখন গেডেস এবং তাঁর বন্ধুটি একেবারে মোহিত হয়ে শুনতে লাগলেন। এত স্বতঃস্ফূর্ত, জ্ঞানগর্ভ, প্রাঞ্জল, মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চমানের কথাবার্তা তাঁদের অজানা ছিল। চাকরেরা যখন ডিনার পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, গেডেস তাদের হাত নেড়ে বারণ করলেন যাতে এই আলাপচারিতায় ছেদ পড়ে রসভঙ্গ না হয়। ডিনার খেতে তাঁদের মধ্যরাত্রি হয়ে গিয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ-সম্পন্ন মানুষ। একবার তিনি তাঁর বন্ধু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে একটি আমন্ত্রণ-পত্র পাঠান। প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন রসায়ন বিদ্যায় পণ্ডিত, গান্ধীজির অনুগামী এবং চরকার নিয়মিত ব্যবহারকারী। এটি সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চরকাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উপযুক্ত জন-হাতিয়ার বলে মনে করতেন না। এই নিয়ে গান্ধীজির সাথে কবির দীর্ঘ, সুস্থ বাদানুবাদ হয়। ব্রজেন্দ্রনাথও চরকার ভক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথের চরকা-অনীহায় প্রফুল্ল চন্দ্র কিছু কড়া মন্তব্য করেন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' নামের এক প্রবন্ধে প্রফুল্ল চন্দ্রের নিন্দাসূচক মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন, যেখানে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে উল্লেখ করেছিলেন 'অবমাননার সহ-শিকার' হিসাবে। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে অন্য রকমের। যে আমন্ত্রণ-পত্রটি তিনি পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি প্রফুল্ল চন্দ্রকে সম্বোধন করেন 'আমার প্রিয় চরকাচার্য' বলে। এই সম্বোধনের দু'ভাবে অর্থ করা যায়। প্রথমটি হল 'চরকার আচার্য' যাতে প্রফুল্ল চন্দ্রের চরকা-প্রীতিকে কটাক্ষ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থে এর দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু রসায়নবিদ চরকের উল্লেখে প্রফুল্ল চন্দ্রকে 'চরক-আচার্য' বলে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবু তিনি কবিকে অতিরিক্ত তোষামদ করা পছন্দ করতেন না। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এবং তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দু'জনেরই প্রিয় ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রশান্ত চন্দ্রকে 'রবির উদয়' পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাসের জন্য পরিহাস করতেন এবং বালক-সুলভ প্রশস্তির জন্য ভর্ৎসনা করতেন। ঠাট্টা করে তাঁর উপদেশ ছিল, "হুঁশিয়ার, যুবক, হুঁশিয়ার! বরং একটু হুইস্কি আর সোডা খাও। তাতে তোমার ভাল বৈ মন্দ হবে না।"

অন্তরাগের দিনগুলি

ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। যদিও তিনি মানসিকভাবে সজীব এবং বৌদ্ধিক-চর্চায় সক্রিয় ছিলেন, তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়নি। এব্যাপারে তাঁর দার্শনিক-সুলভ পর্যবেক্ষণ ছিল, "আমি দু'বার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছি। এখন তৃতীয় এবং সম্ভবত শেষ বারের জন্য প্রতীক্ষা করছি। ভাগ্যের সাথে আমার একটা দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে। না, না, প্রতিযোগিতা নয়। সবই শান্ত এবং পবিত্র। *শান্তম্, শিবম্।*" তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তবু হাতে অনেকগুলি লেখার কাজ ছিল। তাঁর কথিত নির্দেশগুলি একজন বেতনভূক লেখক লিপিবদ্ধ করত।

দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে কন্যাগৃহে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। তাতে নিকট-দূর থেকে আসা শোকবার্তার যেন বন্যা বয়ে যায়। প্রথিতযশা দার্শনিক এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ব্রজেন্দ্রনাথের সুপরিচিত ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জের নামাঙ্কিত অধ্যাপক পদে ব্রজেন্দ্রনাথের উত্তরসূরী ছিলেন। রাধাকৃষ্ণনের শোকবার্তাটি ছিল, "তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর শিক্ষা এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য অধঃস্তন মেধার মানব-মানসে যুগপৎ শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা উৎপাদন করেছিল। বাংলার শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাঁর পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছে, উৎসাহিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। তবে সর্বোপরি স্বভাবের সারল্যে এবং হৃদয়ের বিশালতায় তিনি ছিলেন মহান।"

উপসংহার

দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথের অনেক লেখাই এখন আর মুদ্রিত হয় না। তাঁর অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। পিতার মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রনাথের দুই পুত্র বৃটেনে ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা ব্রজেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক সম্পদের স্বত্ত্বাধিকার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের হস্তে সমর্পণ করেন, যাতে তিনি সেগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথও প্রশান্তচন্দ্রকে অসমাপ্ত আত্মজীবনীটি দিয়ে যান। রোগশয্যায় তাঁর কথিত নির্দেশ অনুযায়ী এটি লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেটিও অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। প্রশান্তচন্দ্র এবং নির্মলকুমারীর মৃত্যুর পর সেটির দিনের আলো দেখার আশাও নির্মূল হয়ে গেছে। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথে শীলের মত উজ্জ্বল তারকাটি আজ নিস্প্রভ। এটি অবশ্যই কাম্য নয়, কিন্তু হয়ত বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপারও নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের সৃষ্টির আবেদন বুদ্ধি ও মননের জগতে, দৈনন্দিনের অবকাশ রঞ্জনের সামগ্রী হিসেবে নয়। তাই তাঁর পরিচিতির ব্যপকতা ও স্থায়ীত্ব গভীর না হওয়াই বোধহয় স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিসম্ভার যে মূল্যবান ও চিরস্থায়ী সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়[4]

ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছি।
বাড়িটি খুব বড় নয়, সাধারণ সাদামাটা বাড়ি।
সেরকম গর্জাস মন্দির টন্দির নয়
গোম্বুজ বা স্পায়ার-টায়ারও নেই।
বাড়ির গেটের নেমপ্লেটে উজ্জ্বল অক্ষরে
শুধু লেখা আছে "ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস"।

বেশ ভিড়। নানারকমের লোকজনই আছে।
বাড়িতে ঢুকতেই একজন থার্মাল চেক করে নিল
তারপর বলল, 'আপনি ঐ রুমটায় বসুন।'
দেখলাম পাঁচটি রুম।
চারটির দরজার মাথায় লেখা আছে
'অর্থী', 'প্রত্যর্থী', 'জিজ্ঞাসু', 'জ্ঞানী'
আর পঞ্চমটার মাথায় 'আদার্স'।
'আদার্স'-য়েই যেতে বলল।
অবাক হয়ে তাকাতেই লোকটি বলল,
"এটা থার্মাল নয়, মেন্টাল চেকিং।"

'আদার্স'-য়েই ঢুকলাম।
ঢুকেই দেখি একজন যুবক আর
একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া অন্য কেউ নেই।
যুবককে খুব চেনা চেনা লাগল।
কোথায় যেন দেখেছি, কিন্তু মনে পড়ছে না।
অতিবৃদ্ধকে চিনতে পারলাম না।

একটু পরে ঈশ্বরবাবু এলেন।
না, মুকুট-টুকুট পরা নেই, চারটে হাতও নেই।
এথনিসিটি আর বয়সটা ঠিক বোঝা গেল না।
অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে
উনি একটু হেসে বললেন,
"কী হে, আকু চট্টো, অবাক হচ্ছো?"
একটু কিন্তু কিন্তু করে বললাম, "স্যার,
সবাই যে রকম বলে ..."

ঈশ্বরবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,
"সবাই-টবাই থাক, তুমি কী বলো?"
আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে উনি হাসলেন,
"আমি আছি কি নেই সেটা বড় কথা নয়,
তুমি কী ভাবো, সেটাই বড় কথা।
দর্শক না থাকলে দৃশ্যও নেই।"

এরকমই কে একজন বলেছিলেন না?
ঠিক মনে পড়ল না।

উনি বললেন, "এদের চিনতে পারছো?"
আমি 'না' বলতেই বললেন,
"তোমার অতীত আর ভবিষ্যৎ।"

ভবিষ্যৎকে চেনা সম্ভব নয়, কিন্তু অতীত?
হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে!
ওই যুবকটাই তো এককালের আমি!

ঈশ্বরবাবু হাসলেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।
ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।
সালকাস-জাইরাস ভরা
ঐ বারোশো গ্রামের যে যন্ত্রটা করোটির মধ্যে
ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাও।
তার মধ্যেই ভরা আছে
যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর।
অমোঘ এনট্রপির টানে হারিয়ে যাওয়ার আগে
ভাবার চেষ্টা কর।
অনর্থক কথায় আর তর্কে বহু দিন কেটে গেছে।"

ঈশ্বরবাবু, তার বাড়ি, তার বাগান
সব মিলিয়ে গেল।
শুধু তিনটি কথা মাথার মধ্যে অনুরণিত হয়ে চলল
“কে সেরা সেরা”[5]।

---

[4] কবি পরিচিতির জন্য ‘চন্দ্রবিন্দুর সন্ধানে সপ্তশৃঙ্গী’ প্রবন্ধের পাদটীকা দেখুন।

[5] “কে সেরা সেরা” (Que Sera Sera) একটি বিখ্যাত ইউরোপীয়ান গানের নাম, যেটি গত শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় এবং সিনেমায় ব্যবহৃত হয়। মানে হল ‘যা হবার হবে’। কথাগুলি হিন্দী সিনেমার গানেও জনপ্রিয় হয়েছে। - সম্পাদক।

মাস্ক

প্রণব কুমার মণ্ডল[6]

দিল্লীর লোকে কিছুটা হলেও মাস্কে অভ্যস্ত, কারণ হল পলিউশান। মাস্ক পরতে কিন্তু আমার একবারে ভালো লাগেনা। 'MASK will be NEW NORMAL' শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছে আমরা ঠিক অভ্যস্ত হয়ে যাবো, যেতেই হবে। আমাজনের গভীর জঙ্গলে পোশাকহীন মহিলাদের দেখে সভ্য-সমাজের গবেষক বলে ফেলেছিল, 'তোমাদের লজ্জা করে না?' খিলখিলয়ে হেসে নগ্নসুন্দরী উত্তর দিয়েছিল, 'তোমাদের এই সব পরে থাকতে লজ্জা করে না?' পোশাক পরা, আর না-পরা – দুটোই লজ্জার কারণ হতে পারে, আর তা এত আপেক্ষিক যে ভাবলে বেশ লাগে। আমার দিদিমার মা কোনদিন ব্লাউজ পরেন নি, লজ্জা করতো বলে। আমার গ্রামের স্কুলে প্রায় কেউ চটি পরে আসতো না, তাই আমারও চটি পরতে খুব লজ্জা করতো। মা বাড়ী এলে জোর করে পরাতো আর যেখানে যেতাম, চটি ফেলে বাড়ী আসতাম, ঠিক বৃষ্টি থামার পর ছাতা ফেলে আসার মতো। কত জোড়া যে হারিয়েছি জানিনা। তেমনি আমার জন্মদিনের আগে পোস্টে একটা পার্সেলে আসতো - নতুন জামা-প্যান্ট, যা আমি কোনোদিন লজ্জায় পরতে পারিনি। আমাদের গ্রামের আর আশপাশের গ্রামের কেউই তখন জন্মদিনে নতুন জামা পরতে শুরু করেনি। তাছাড়া জানতোই না কবে তার জন্মদিন। আমার ঠাকুমার কিন্তু একটা হিসেব ছিল..... তাই 'বোশেক মাসে আলা উঠলে' (মানে শুক্ল পক্ষ এলে) আমার কাকার জন্যে একদিন পায়েস হ'ত, বাড়ির সবাই খেতাম, ব্যাস ওই পর্যন্ত।

তাই পোশাক যে সব সময় লজ্জা নিবারণের জন্যেই হতে হবে তা নয়, লজ্জার কারণও হতে পারে। আমরা, মাস্ককে পোশাকের অঙ্গ করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে ম্যাচিং মাস্ক বাজারে বেরোতে শুরু করেছে। শাড়ীর সাথে ম্যাচিং ব্লাউজ, ম্যাচিং জুতো, ম্যাচিং টিপ, ম্যাচিং দুল.....সাথে ম্যাচিং মাস্ক। লিপষ্টিকও ম্যাচিং, কিন্তু এখন ঢাকা পড়ে যাবে। গান বাঁধা হবে - মাস্ক কি পিছে ক্যা হ্যায় ...টিং টিং টিং টিং ...। প্রথম প্রেমের চুমুটাও মাস্ক পরেই হবে। রাজ কাপুরের – ববি, সত্যম শিবম...., রাম তেরী... র মতো, সাহসী পরিচালক যখন বেশ ক'বছর পর মাস্ক ছাড়া প্রেম দেখাবে, আমরা ছিঃ, ছিঃ করবো। আর যারা আধুনিক, তারা আড়ালে বলবে – 'এটা কিন্তু আদিত্য চোপড়া বাড়াবাড়ি করেছে। এমন ভাবে মাস্ক খুলে প্রেম, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কি শিখবে!'

সত্যি বলছি, সেই সোয়াইন ফ্লুর সময় এক প্যাকেট এন-৯৫ মাস্ক কিনেছিলাম, কিন্তু একদিনও পরতে পারিনি, লজ্জায়। এবারতো আবার না পরলেই লজ্জা। না পরে অফিস যাওয়া যেন গেঞ্জি গলিয়ে স্টাফ মিটিঙে বসার মতো। আমরা, তখন বাড়িতে থাকলে খালি গায়ে, আর বাইরে বেরলে জামা গলাতাম। আর এখন খালি গায়ে বাড়িতে থাকলেও বৌ বলে 'অমন অসভ্যের মতো খালি গায়ে বসে আছো কেন?' তেমনি, আমার লজ্জা কেটে যাবে, বাইরে পরবো, আস্তে আস্তে বাড়িতে পরবো। 'New Normal', 'নতুন স্বাভাবিক' - ঠিক মানায় না। তাই হবে 'নতুন নিয়মমাফিক' আর তার পর এটাই হবে 'স্বাভাবিক'।

ম্যাচিং মাস্ক - নিউ নরম্যাল আল্ট্রা! (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ছবিগুলির অজানা স্রষ্টাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।)

[6]লেখক ছোটবেলায় ছিলেন বর্ধমানের গ্রামের স্কুলের 'খালিপদ' ছাত্র। বর্তমানে তিনি দিল্লীর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থানের উদ্ভিদ জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক। একটু-আধটু লেখালেখি করেন। 'অঙ্কুর'এ এটি তাঁর প্রথম লেখা।

অপরিযায়ী মধ্যবিত্ত

প্রণব কুমার মণ্ডল[7]

মিলিয়ে-জুলিয়ে ষাটটি হাজার, খুব একটা কমও না
মাসকাবারি, মুদিখানা, দুধের হিসেব, সব গোনা।

রবিবারে খাসির মাংস, মাসে একবার পিভিআর,
এই নিয়েই দিব্যি চলে ছোট্ট সুখের এ সংসার।

ফি'বছরে না হলেও একটা বছর ছেড়েই হয়,
দীঘা, পুরী, গোয়া সেরে গত বছর হিমালয়।

গিন্নী আমার করিতকর্মা, পরিপাটি, এম এ পাশ।
বড় ছেলে ক্লাস ফাইভে, খুকির সবে বাইশ মাস।

মাসে একবার ভুরু প্লাকিং, ফেসিয়াল আর চুলের সাজ,
একটা মেয়ে কাপড় কাচে, অন্যটার সব ঘরের কাজ।

রবিবারে আঁকার ক্লাস আর অঙ্কে ছেলের টিউশানি।
মেয়ের দারুন গানের গলা, এখন থেকেই হারমনি।

গিন্নীর আবার ডিমান্ড আছে পরের বছর গাড়ি চাই।
বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা হ'ল প্রোমোশনটা আগে পাই।

আমার মাথায় গাড়ি তো নয়, ভালই আছি দু' চাকায়।
এবার একটা ফ্ল্যাটের বুকিং, হয় নিউটাউন নয় জোকায়।

অনেক হল আলোচনা, তিরিশ লক্ষ বাড়ীর লোন,
তিরিশ হাজার প্রতি মাসে ইএমআই-এর টাকা গোন।

সব মিলিয়ে চলছে সুখে চাকরি এবং এ সংসার।
একটুখানি গুছিয়ে নেবো বার্ধ্যকের প্ল্যান এবার।

এমনি সময় হঠাৎ করে, আচমকা এক চীনে রোগ,
রাতারাতি বন্ধ সবই লকডাউনে কি দুর্ভোগ।

প্রথম মাসটা কাটলো ভালো, ঘরে বসেই মাইনে পাই,
দ্বিতীয় মাসে হাফ স্যালারি, ফোন করলেও জবাব নাই।

আমি ভাবছি বসে বসে কি করে কি করবো হায়,
তিরিশ হাজার লোনের টাকা এবার থেকে পাই কোথায়।

দিন পনেরো যেতে যেতেই ই-মেলেতে চিঠি পাই,
কোম্পানির নেইকো আয়, করতে হবে কর্মী ছাঁটাই।

এক্ষুনি নয়, তবে হবে আর এক-দু মাস করলে পার
এ মাসেতে মাস-মাইনে কেটে কুটে একের চার।

বলবো কাকে? শুনবে টা কে? আমি যে নয় পরিযাই
ফ্রিতে রেশন, সেবামিশন কিছুতেই নাই আমার ঠাঁই।

রাতে আমার ঘুম আসেনা, ছেলে মেয়ের মুখে চাই
হইনি কেন দিনমজুর বা বিপিএল-ওয়ালা পরিযাই।

কোথায় যাব, কোথায় পাবো, বৌ যে আমার পারে না।
কাজের বাড়ি, কুলি কামিন, সে ভাবনাও ছাড়ে না।

কাকে বলি কে বা শোনে, গরীবের ছাপ নেইকো গায়,
মন্ত্রী নেতা নিউজ চ্যানেল সবাই দেখায় পরিযায়।

হচ্ছে মনে অমনি হলে পেতাম খেতে চাট্টি ভাত
ভেবে ভেতর যাচ্ছে ফেটে কালকে সবার খালি পাত।

****

সম্পাদকের সংযোজন

তবে এই হ'ল পদব্রজে বাড়ি ফেরার পথে
ক্ষুধার্ত উদ্‌ভ্রান্ত পরিশ্রান্ত পরিযায়ী পরিবার

[7] কবি পরিচিতির জন্য 'মাস্ক' রম্যরচনাটির পাদটীকা দেখুন। পূর্বে প্রকাশিত এই কবিতাটি কবির অনুমতিক্রমে সম্পাদনাকালে চিত্রসহযোগে অঙ্কুরে পুনঃপ্রকাশিত হ'ল।

৪

সবাই ভবেশ নাগের ছাতে,
কালী পূজোর আগের রাতে,
চোদ্দ প্রদীপ হেথায় হোথায়,
রাত্রি ন'টা - সাড়ে ন'টায়,
দেখতে পেলেন ভোলার মাউই
একটা ফানুস, কয়টা হাউই;

'হোথায় আবার ঘুরছে কারা,
লেংচায় কি এক বেচারা?'

বললো সবাই, মাঠা'ন, রাতে
অমন দেখায় কুয়াশাতে।

'না না দ্যাখো পাথর পেতে,
পেছনে ঐ সর্ষে ক্ষেতে
ঝাঁজরাতে কি বোঁদেই ভাজে,
মাঝ রাতে ওই মাঠের মাঝে?

গাবতলাটা পার হোলো কি?
টিউকলে সব জল খেলো কি?'

[৪] কবি পরিচিতি - অমল সান্যাল নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের বাসিন্দা এবং সেখানকার লিঙ্কন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। 'অঙ্কুর' এবং ওয়েলিংটনের আর একটি প্রকাশনা 'বৈশাখী'র জন্ম থেকেই তিনি এদের প্রতিটি সংখ্যাকে মজার মজার ছড়া এবং ছবি দিয়ে সমৃদ্ধ করে আসছেন।

বললো ভোলা, শুনুন মাঠা'ন,
শীতটা গেলেই ছানি কাটান।
মাউই বলেন, 'না বাপ, শোনো,
চোখ বুঁজে সব সাতশো গোনো।

এই তিথিটায় রেতের বেলা,
ওঁরাই বেরোন করতে খেলা।
ওদিক পানে তাকিও নাকো,
চোখ মুদে শ্বাস রুখে থাকো'।
*** *** ***

নকুড় দাসের ভাইপো ঈশান,
বললো ওসব সুপারস্টিশান।
পরশু আসুন 'যুক্তি' ক্লাবে,
দেবেশদা'রাই সব বুঝাবে।
ভড়ের জামাই, ঠোস NRI,
বললো, 'এসব হয় হামেশাই।

ত্যাঁদোর প্রাণী অন্য গ্রহর,
ফানুস চড়েই অষ্ট প্রহর,
খুঁজছে data ঠোরে ঠারে,
ওরাই নামে বন বাদারে।

এই সেদিনই আরিজোনায়,
নেমেছিল লেকের কোনায়।
হিম পড়ছে, খুব কুয়াশা,
চলুন এবার যে যার বাসা'।
*** *** ***

উঠলো যখন সুয্যি রাঙ্গা,
বোস দেখলো দরজা ভাঙ্গা।
গয়না-শাড়ি সব গিয়েছে,
অন্য জিনিস বেছে বেছে।
নিচের তলার রান্না ঘরে
বোঁদের গোলা ডেকচি ভরে,
চিনির রসের বিরাট বাটি,
দামী জুতোও কয়েক পাটি।
ঝাঁজরা, কড়াই তাও গিয়েছে,
লেপে পুঁছেই সব নিয়েছে।
*** *** ***

পাটভাঙা থান গালেতে পান
সামনে এলেন মাউই মাঠা'ন।
'চুরির ব্যাপার পুলিস ধরুক,
কিন্তু সবাই স্বীকার করুক
ভবেশ নাগের পূবের ছাতে,
ভূত চদুশীর পুন্যি রাতে,
চাঁদগাঁর এই কনকবালা
সাফ দেখেছে ওঁদের খেলা'।

একটা সৌখিন চিঠি

অরুণাচল দত্তচৌধুরী[9]

অন্য কিছু লিখব ভাবি, খসড়াও তৈরি হয়ে আছে
কিন্তু এই চিঠি লেখা তার চেয়ে অনেক জরুরি
তোমরা কেমন আছো? প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক।
(এখানে বিদ্যুৎ জল সব আছে পাহাড়ি শহরে
এমনকি টাওয়ারও আছে, যা থাকে না অনেক সময়ই
শুধু নেই তোমাদের কুশল সংবাদ)

এত আতঙ্কের রাত এর আগে কখনও আসেনি
ছবি দেখছি নেটে নেটে ধূলিসাৎ অরণ্য বসত
মাথার ওপরে চালা উড়ে গেছে অনিশ্চয়তায়
কালকে কী হবে তবে? তা ভাবার বিলাসিতা রেখে
আজকের বাঁচাটুকু প্রামাণ্য করার প্রয়াস
কান্নায় ছড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে রঙিন পিক্সেলে
সত্যি কাল কী যে হবে! কোভিডের ত্রাসকথা ছেড়ে
এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে সদ্য ভোলা জীবাণু সকল
কোথায় পানীয়জল, কোথায় বা লজ্জা আবরণ,
সামান্য খুদকুঁড়ো কেড়ে নিতে চোরেরা হাজির
সমুদ্রের লোনা জল খেয়ে নিল সাধের আবাদ
ত্রিপল খিচুড়ি আর ভিক্ষাসার মলিন জীবন
এসবই কি তোর পাওনা, উপকূল জননী আমার?

নিতান্ত শৌখিন চিঠি পৌঁছোবে না... না যদি পৌঁছোয়ও
তোকেই দাঁড়াতে হবে ঘুরে... ফের নিজস্ব প্রথায়
রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় আজও তুই শিখিসনি মাগো
কিন্তু পায়ের নীচে এ পিচ্ছিল কাদামাটি শ্বাসমূল তোরই
ওপড়ানো ওই গাছ, সবুজের ধ্বস্ত সমারোহ
তোকেই ফেরাতে হবে, খিদে পেটে কাঁপা কাঁপা হাতে
আবার ছাইতে হবে চালাখানি মাথার ওপরে
আর তারই মাঝে
চোয়াল শক্ত আর দুই চোখে সমুদ্র ঝরিয়ে
নিজেরই মৃতদেহটি মাগো,
নিজে তুই বয়ে নিবি শ্মশানে কবরে।

[9] ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরী বারাসতবাসী একজন চিকিৎসক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অতিসচেতন একজন স্পষ্টবাদী কবি। তাঁর অনেক কবিতাতেই এই স্পষ্টবাদিতা প্রতীয়মান। এবছরের মে মাসে বাংলায় সুপার সাইক্লোন আমপানের ধ্বংসলীলার অব্যবহিত পরেই এই কবিতাটি লেখা।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়ের[10] আরও দুটি কবিতা

একা

বৃক্ষ হয়ে দিন কেটে যায় অরণ্যতে একা,
শিকড় অতি জীর্ণ হলো নাইকো জলের দেখা।
'পর্ণমোচী' সংজ্ঞা পেলাম ঝরলো যত পাতা,
হাজার হাতে লিখবো বলে আকাশ হলো খাতা।
আকাশ হাসে আকাশ ভাষে বধির আমার কান,
আকাশ বাণীর মর্ম খুঁজে মগজটা খান খান।
দিন কেটে যায় বছর ঘোরে কালপুরুষে হাসে,
'অনেক হলো, এবার চলো' নীরব ধ্বনি ভাসে।
যেতে তো চাই, কোথায় যাবো? কোথায় পাবো দেখা?
কেউ বলে না, বৃদ্ধ হলাম, অপেক্ষাতে একা।

নেক্সট ডেস্টিনেশন

ধূধূ মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট স্টেশনে বসে আছি।
স্টেশনের লাল মোরামের প্ল্যাটফর্মটা ছুঁয়ে
একটা উদ্ধত এক্সপ্রেস ট্রেন
হুহু করে ছুটে বেরিয়ে গেল।
তার জানালায় জানালায় কত নিষ্পাপ মুখ।
আমার ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছি।
ঘণ্টি বেজে গেছে। টিকিটটা তো বহুদিন আগেই কাটা।
সঙ্গীরা কেউ আগেই চলে গেছে তাদের নিজস্ব ট্রেনে।
আবার কেউ কেউ কথা দিয়েও আসেনি।
একটু আগেই স্টেশন মাস্টার এসে বলে গেলেন,
'চিন্তা নেই, এই ট্রেন কখনও লেট করে না,
কখনও বাতিল হয় না। শুধু একটাই অসুবিধা
অ্যারাইভাল টাইমটা যে ভাষায় লেখা
সেটা আজ অবধি কেউ পড়ে উঠতে পারে নি।'
প্ল্যাটফর্মের মোরামের উপর দুটো শালিখ বসে আছে।
একটা বেজি দৌড়ে চলে গেল।
পাশের ঝুপসি গাছটায় একটা পাখি
অনেকক্ষণ থেকেই ক্লান্ত স্বরে ডেকে যাচ্ছে।
আকাশে হালকা অল্টোস্ট্র্যাটাসে
সোনালি লাল রঙের আবির ...
প্ল্যাটফর্মের মাটি কি অল্প অল্প কাঁপছে?
সে কি আসছে?

[10] কবি পরিচিতির জন্য 'চন্দ্রবিন্দুর সনহানে সপ্তশ্রুঙ্গী' প্রবন্ধের পাদটীকা দেখুন।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার

তাপস কুমার সরকার[11]

যাঁরা কলকাতার ইতিহাসের চর্চা করেন তাঁদের কাছে সাবর্ণ রায় চৌধুরী নাম অপরিচিত নয়। এই পরিবার কলকাতার বনেদী পরিবারগুলির মধ্যে বোধহয় শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। আধুনিক কলকাতার অনেকটাই এঁদের অতীতের জমিদারীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার অনেক কিছু ঘটনার সঙ্গে এই পরিবারের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কলকাতার প্রথম পাকা রাস্তা এঁদের তৈরী, প্রথম পাকা বাড়িও। প্রথম দুর্গাপূজো সাবর্ণ পরিবারেই। প্রথম রথযাত্রাও এঁদের অবদান। কালীঘাটের এখনকার মন্দির এই পরিবারের গড়া।

এখানে বলে রাখা ভাল যে সাবর্ণ রায় চৌধুরী কারুর নাম নয়। পরিবারের "রায় চৌধুরী" পদবীটি উপাধি হিসাবে এক পূর্বপুরুষের পাওয়া। কথিত আছে যে এঁদের আদিপুরুষ মহর্ষি সাবর্ণ। তাঁরই বংশধর ঋষি বেদগর্ভ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ আদিশূরের আহ্বানে বাংলায় আসেন। এই ঘটনার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই তত্ত্বগুলো কুলজীপত্রিকাতে লেখা আছে, সত্যি/মিথ্যে জানা নেই।

এই আদিশূরের কাহিনী শোনবার মত, এখানে সংক্ষেপে বলি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে কয়েকশো বছর বাংলায় পাল বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ। কয়েকশো বছরের মধ্যে দেশে হিন্দু পুরোহিতের অভাব ঘটে, কারণ রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাগযজ্ঞ করতেন না। দশম শতাব্দীতে আদিশূর রাজা হলেন। তিনি হিন্দু। তাঁর যজ্ঞ করার প্রয়োজন ঘটল। কিন্তু পুরোহিতের অভাব। কান্যকুব্জ (আধুনিক কনৌজ) হিন্দুত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গরাজ কান্যকুব্জরাজকে অনুরোধ করলেন যে তাঁকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঠানো হোক যজ্ঞ করার জন্য। কান্যকুব্জরাজ সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। আদিশূর ক্ষেপে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন। তিনি বুদ্ধি করে কান্যকুব্জে সাতশো ব্রাহ্মণ পাঠালেন মোষের পিঠে চড়িয়ে, আশা যে কান্যকুব্জের রাজা গোহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যা করবেন না। তাঁর অনুমান সফল হল। পাঁচটি ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের পাঁচটি অনুচর এলো কান্যকুব্জ থেকে। তাঁরা যজ্ঞ সমাপ্ত করে কান্যকুব্জে ফিরে গেলেন। তার পরেই গণ্ডগোল। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা এই পাঁচজনকে শহরে ঢুকতে দিলেন না, বললেন যে তাঁরা অশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তের বহর শুনে এই পাঁচজন তা করতে রাজি হলেন না। আবার বাংলায় ফেরা। আদিশূর তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ করলেন এবং পাঁচটি গ্রাম দিলেন তাঁদের থাকার জন্য। এই পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন বেদগর্ভ। তাঁর ভাগ্যে পড়ল গঙ্গা নামে গ্রাম। সেই গ্রামের নাম থেকে তাঁর পদবী হল গঙ্গোপাধ্যায়। উপাধ্যায় মানে শিক্ষক। বলা বাহুল্য এগুলো সব কাহিনী, এর সত্যতা জানা নেই। আজকাল গঙ্গোপাধ্যায়কে অনেকে গাঙ্গুলী করে নিয়েছেন।

বেদগর্ভই এই বংশের প্রথম পুরুষ। ঊনিশ পুরুষে এলেন পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল অশ্বারোহী হিসাবে। হুমায়ূন আর শের শহের যুদ্ধে ইনি হুমায়ূনের অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করে খ্যাতি লাভ করেন। হুমায়ূন ওঁকে 'শক্তি খাঁ' উপাধি দেন। ইনি ইতিহাসের পাতায় 'পঞ্চু শক্তি খাঁ' বলে পরিচিত। হুমায়ূন ওঁকে ৮৫টা গ্রামের জমিদারী দেন। তিনি তাঁর জমিদারীতে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করলেন। হিন্দীতে প্রাসাদকে বলে হাভেলি। তার থেকে এই অঞ্চলের নাম হ'ল হাভেলিশহর এবং কালক্রমে হালিশহর।

জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় পঞ্চু শক্তি খাঁয়ের পৌত্র। তাঁর সংস্কৃতে এবং ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' বলা হ'ত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পদ্মাবতী দেবী। জিয়া এবং পদ্মাবতী নিঃসন্তান ছিলেন। গুরুজনদের পরামর্শমত কালীক্ষেত্রে মা কালীর সাধনা শুরু করলেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আত্মারাম ব্রহ্মচারীর নির্দেশনায়। ১৫৭০ সালের জানুয়ারী মাসে পুত্র লক্ষ্মীকান্তর জন্ম হল। পদ্মাবতী পুত্রের জন্মের পরেই মারা যান। শোকার্ত জনকের আর সংসারধর্মে রুচি রইল না। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম নিলেন কামদেব ব্রহ্মচারী। তারপরে বহু তীর্থ ভ্রমণের পর বারাণসীতে বসবাস করা শুরু করলেন।

[11] তাপস সরকার ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে অপারেশন রিসার্চ পড়াতেন। তিনি বেশ কয়েক বছর হ'ল অবসর নিয়েছেন। তাঁর তথ্যনির্ভর লেখার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। শ্রী সরকার ওয়েলিংটনের সবচেয়ে বর্ষীয়ান বাঙালী।

কালীঘাটের পুরাতন নাম কালীক্ষেত্র। তবে তখনকার পুরনো মন্দির আর নেই। এখনকার মন্দির রায় চৌধুরী পরিবারের গড়া। মন্দির নির্মাণ শুরু করলেন সন্তোষ রায় চৌধুরী ১৭৯৯ সালে এবং শেষ হ'ল পৌত্র রাজীব লোচন রয় চৌধুরীর আমলে ১৮০৯ সালে। মন্দিরের ভিতরে কষ্টিপাথরের বিগ্রহ রায় চৌধুরী পরিবারের কুলদেবী মাতা ভুবনেশ্বরী ধাঁচের। লক্ষ্মীকান্ত মন্দিরকে প্রায় ৬০০ বিঘে জমি দিয়েছিলেন পূজো এবং মন্দিরের অন্যান্য খরচের জন্য।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী লক্ষ্মীকান্তকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেন। একুশ বছর বয়সে যশোরের রাজা বসন্ত রায় ওঁকে যশোরে নিয়ে যান রাজস্ব বিভাগে কাজ করার জন্য। কালক্রমে তিনি রাজস্ব মন্ত্রী হন। তিনি এবং বসন্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপাদিত্য যশোরের প্রচুর উন্নতি সাধন করলেন।

বসন্ত রায়ের মৃত্যু ঘটে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপাদিত্যের হাতে। লক্ষ্মীকান্ত চাকুরী ছেড়ে কালীক্ষেত্রে ফিরে যান। তারপর প্রতাপ যশোরের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তখন মুঘল রাজত্ব। আকবর সৈন্য পাঠিয়ে প্রতাপকে দমন করতে পারলেন না।

আকবরের পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে পাঠালেন বাংলায়। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু ঘটে মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে। কামদেব ব্রহ্মচারী ছিলেন মানসিংহের গুরু। প্রতাপের পতনের পর মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে যশোরের শাসনভার দিতে চাইলেন। অনেক অনুরোধের পর লক্ষ্মীকান্ত সেটি গ্রহণ করলেন। বাদশা জাহাঙ্গীর এত খুশী হয়েছিলেন যে তিনি লক্ষ্মীকান্তকে এক বহুমূল্য আংটি উপহার দেন। মানসিংহও গুরুদক্ষিণা হিসাবে লক্ষ্মীকান্তকে আটটা পরগণার জায়গির দিলেন। জায়গিরদারি ছাড়াও লক্ষ্মীকান্ত মুঘলদের কাছ থেকে একাধিক উপাধি পান – মজুমদার, রায় এবং চৌধুরী। এখন এগুলো পদবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জায়গির হুগলী নদীর পূর্বতীরে হালিশহর থেকে এখনকার ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটার মধ্যে ছিল যে সব গ্রাম, সেগুলো থেকে পরে কলকাতা শহরের উৎপত্তি। তখন থেকে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে কলকাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বড়িশায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের আটচালা মন্দিরে দুর্গাপূজো

লক্ষ্মীকান্ত সুশাসক ছিলেন। তিনি সুতানুটী গ্রামে বিদেশী বণিকদের আকর্ষিত করলেন সুতোর ব্যবসায়ের লোভ দেখিয়ে। ইংরাজ, ওলন্দাজ ও আর্মাণী বণিকেরা মেতে গেলেন ব্যবসায়। তিনি কলকাতা অঞ্চলে প্রথম পাকা রাস্তা তৈরী করলেন হালিশহর থেকে কালীক্ষেত্র (বর্তমানের কালীঘাট) পর্যন্ত। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিল পিলগ্রিমস রোড। চিৎপুর রোড, অর্থাৎ এখনকার রবীন্দ্র সরণী এই রাস্তার অন্তর্গত ছিল। স্ত্রীর উৎসাহে তিনি প্রথম কলকাতায় সপারিবারিক দুর্গাপূজা চালু করলেন। সেখানে এক কাঠামোয় এক চালচিত্রের নিচে মা দুর্গার সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা – লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ দাঁড়িয়ে। এই পূজো এখনও হয় – কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িশা আটচালার পূজো। তাছাড়া এই পরিবার আরো সাতটা পূজো হয় – পাঁচটা বড়িশায়, একটি বিরাটিতে এবং আর একটি নিমতাতে।

বৃটিশরা বাংলায় আসার আগে রায় চৌধুরীরা এখনকার বি বা দি বাগ অঞ্চলে কাছারী বাড়ি এবং মন্দির তৈরী করেছিলেন। আধুনিক রাইটার্স বিল্ডিং এর জমিতে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। কাছারী বাড়িটা ছিল পাকা এবং দোতলা। এটাই কলকাতার

প্রথম পাকা বাড়ি। বৃটিশরা ১৬৯০ সালে সুতানটীতে এসে মুঘলদের কলকাতার অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করে। এ জমি ছিল রায় চৌধুরীদের জমিদারী। তাঁরা জমি ছাড়তে চাননি। জবচার্ণকের জামাতা চার্লস আইয়ার মুঘল বাদশা ফারুখসিয়ারকে ভুলিয়ে এক সনদ জোগাড় করল। তাতে লেখা ছিল যে জমিদার বিদ্যাধর রায় চৌধুরী যেন সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলিকাতার ইজারা অতি অবশ্যই ইংরাজদের দেন। তাই হ'ল বাৎসরিক ১৩০০ টাকার বিনিময়ে। রায় চৌধুরীরা বড়িশাতে উঠে গেলেন। ১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ (পলাশীর যুদ্ধ) অবধি এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তারপরে অবশ্য সবটাই ইংরাজদের দখলে চলে যায়।

কলকাতার প্রথম রথযাত্রাও এই পরিবারের কীর্তি। কৃষ্ণদেব রায় চৌধুরী ১৭১৮ সালে এই রথযাত্রা শুরু করেন বড়িশাতে। তা এখনও চালু আছে। সন্তোষ রায় চৌধুরী ১৭৮০ সালে বড়িশাতে বারোটি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন।

বড়িশার দ্বাদশ শিবমন্দির

এই পরিবারের আর নাম করা পুরুষরা হলেন স্বামী যোগানন্দ (ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং সারদা মায়ের শিষ্য), গীতি-কবি প্রণব রায় এবং ক্রিকেট খেলোয়ার সৌরভ গাঙ্গুলী।

১৯৬৬ সালে এই পরিবার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ স্থাপন করেন। এই পরিষদের কাজ হ'ল পারিবারিক প্রথা বজায় রাখা, ঐতিহাসিক গবেষণা এবং তার প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। সাবর্ণ সগ্রহশালার জন্ম ২০০৫ সালে। এঁরা সমস্ত পারিবারিক সম্পদ, তার অনেকই এখন দুর্লভ, সংগ্রহ করে এই মিউজিয়ামে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন।

সাবর্ণ সংগ্রহশালা

এতদিন পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল যে কলকাতার জন্মদাতা (প্রতিষ্ঠাতা) জব চার্ণক এবং জন্মদিন ২৪ আগস্ট ১৬৯০। এইদিন চার্ণক সুতানুটীতে পদার্পণ করেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কয়েকজন এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করলেন যে এটা ভুল। হাইকোর্ট পাঁচজন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক নিয়ে এক কমিটি গঠন করলেন বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য। এই কমটির সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই সাধন বসু। আর সভ্যরা ছিলেন ঐতিহাসিক বরুণ দে, সুশীল চৌধুরী, অরুণ দাশগুপ্ত এবং প্রদীপ সিংহ। এঁরা গবেষণা করে হাইকোর্টকে জানালেন যে কলকাতা গ্রাম বহুদিন ধরেই বর্তমান এবং এর কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই, কোন জন্মদিনও নেই। হাইকোর্ট এই অভিমত মেনে নিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানালেন। এটা ঘটে ২০০৩ সালে।

কলকাতার জন্মদিন নেই, প্রতিষ্ঠা করেননি চার্নকও

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

সুতরাং কলকাতা পিতৃহীন এবং জন্মদিনহীন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের ইতিহাস শুনলে মনে হয় যে লক্ষ্মীকান্ত পিতৃত্বের দাবি করতে পারেন। পাঠক-পাঠিকারা কি বলেন?

(এই লেখাটির বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং ছবিগুলি সন্ধান ও সংযোজন করার জন্য
অঙ্কুরের সম্পাদক দিলীপ দাসকে ধন্যবাদ - লেখক।)

সুখী রাজপুত্র

(আইরিশ কবি, নাট্যকার এবং লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের[12]
বিখ্যাত রূপকথা'The Happy Prince'এর বাংলা অনুবাদ)
অনুবাদক – অঙ্কুরের সম্পাদক দিলীপ কুমার দাস

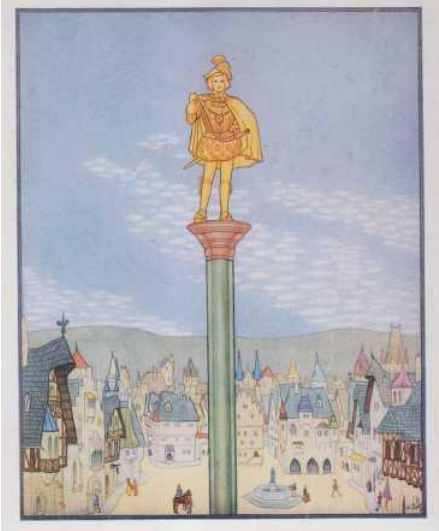

শহরের অনেকটা উপরে একটি খুব উঁচু স্তম্ভের উপর সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটি দাঁড়িয়েছিল। তার শরীর খুব সুন্দর সুন্দর পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। আর চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল দুটি নীলকান্তমণি দিয়ে গড়া। তার তরবারির হাতলে ঝকঝক করত লাল রংয়ের বড় একটি চুনি।

সবাই তার প্রশংসা করত। নগর পরিষদের এক সদস্যের মন্তব্য ছিল, "ওটি হাওয়া-মোরগের মত সুন্দর, কিন্তু তেমন কাজের নয়।" সদস্যটি শিল্পকলার সমঝদার হিসাবে স্বীকৃতি পাবার প্রত্যাশী ছিলেন। আবার লোকে যাতে তাঁকে কাণ্ডজ্ঞানহীন মনে না করে সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। বাস্তবে তিনি কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না।

একটি ছোট ছেলে চাঁদ নেবে বলে কান্নাকাটি করছিল। তার মা তাকে এই বলে বোঝাচ্ছিল যে, "তুমি কেন সুখী রাজপুত্রের মত হতে পারো না? সুখী রাজপুত্র কোন কিছুর জন্য কান্নাকাটি করার কথা স্বপ্নেও ভাবে না।"

একজন হতাশ মানুষ এই সুন্দর মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, "আমি আনন্দিত যে এই পৃথিবীতে একজন সুখী মানুষ আছে।"

টকটকে লাল রংয়ের জোব্বা এবং তার ওপর পরিস্কার সাদা পিনাফোর (ঢোলা হাতকাটা ব্লাউজের মত পোষাক) পরা, অন্যের বদান্যতায় বড় হওয়া ছেলেরা গীর্জা থেকে বেড়িয়ে আসতে আসতে বলল, "মূর্তিটা দেবদূতের মত দেখতে।"

"তোমরা কি করে জানলে? তোমরা তো কোনদিন দেবদূত দেখনি।" প্রশ্ন করলেন এক গণিতজ্ঞ শিক্ষক।

"আহ্! কিন্তু আমরা স্বপ্নে দেবদূত দেখেছি," ছেলেরা উত্তর দিল। এই শুনে গণিতজ্ঞ শিক্ষকটি ভ্রূ কোঁচকালেন এবং তাঁকে রুষ্ট দেখাল। তিনি বাচ্চাদের স্বপ্ন দেখা অনুমোদন করতেন না।

[12] রূপকথাটি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক অস্কার ওয়াইল্ড চেয়েছিলেন এটি যেন বাচ্চাদের পড়ে শোনানো হয়।

এক রাত্রে শহরের আকাশে একটি ছোট্ট সোয়ালো পাখি উড়ে এল। তার বন্ধুরা ছ'সপ্তাহ আগেই ঈজিপ্টে চলে গেছে, কিন্তু সে এখনও এদেশে থেকে গেছে। কারণ সে এদেশের সবচেয়ে সুন্দরী নল-খাগড়ার প্রেমে পড়েছে। প্রথম বসন্তে যখন সে একটা হলুদ মথকে ধরবে বলে তাড়া করে নদীর উপরে উড়ে এসেছিল, তখন সে নলের সরু কোমর দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার সাথে কথা বলার জন্য থেমেছিল।

কোন রকম ধানাই-পানাই না করে সোয়ালো নলকে সরাসরি বলেছিল, "আমি কি তোমাকে ভালোবাসতে পারি?" নল নীচু হয়ে বাও করে তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। সুতরাং সোয়ালো নলের চারিদিকে ঘুরপাক দিয়ে উড়ছিল এবং তার ডানা দিয়ে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাতে রুপোলী ঢেউ তুলছিল। এই ছিল তার পূর্বরাগ, যা গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়েই চলল।

এতে অন্য সোয়ালোরা কিচির মিচির করে বলল, "এ আবার কেমন প্রেম-ভালবাসা? নলের ধন-দৌলত কিছুই নেই। তার উপর তার যা বিরাট গোষ্ঠি।" সত্যি বলতে কি নদীটা অনেক অনেক নল-খাগড়ায় ভর্তি ছিল। যাইহোক হেমন্ত আসতেই অন্য সব সোয়ালোরা দেশান্তরী হয়ে গেল।

বন্ধুরা চলে যাওয়ায় সোয়ালো নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল, প্রেমিকার সম্পর্কেও খানিকটা হতাশ সে। বলল, "কতদিন তার সঙ্গে কথাবার্তা নেই। আমার সন্দেহ যে সে প্রণয়ের ভান করেছে। হাওয়ার সঙ্গে তার যা মিতালি!" আর সত্যিই যখন বাতাস বইত, তখন নল হেলে দুলে কতই না খুশী হ'ত, আনন্দে ঢলে পরত। সোয়ালো বলে চলল, "আমি জানি নল ঘরকুনো। কিন্তু আমি তো ঘুরতে ভালবাসি। সুতরাং আমার বউও ঘুরতে ভালবাসবে এটাই আমি চাই।"

শেষে একদিন সোয়ালো নলকে বলল, "তুমি কি আমার সাথে আসবে?" নল মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। তার ঘরের টান যে খুবই জোরালো।

"তুমি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছ। আমি পিরামিডের দেশে চললাম। গুড বাই।" এই বলে সোয়ালো উড়ে গেল।

সারাদিন ওড়ার পর রাত্রিবেলায় সোয়ালো শহরে এসে পৌঁছাল। "এখন আমি থাকব কোথায়? শহরে নিশ্চয়ই থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে," বলল সে।

তারপর সে উঁচু স্তম্ভটার উপর মূর্তিটা দেখতে পেল।

"আমি ওখানেই থাকব," বলল সে। "জায়গাটা ভাল, চারদিকে স্বচ্ছ তাজা বাতাস।" এই বলে সে সুখী রাজপুত্রের পায়ের কাছে বসল।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে মৃদুস্বরে বলল, "আমার শোবার ঘরটি দেখছি সোনালী।" এই বলে সে শোবার তোড়জোড় করল। যখন সে তার মাথাটি ডানার মধ্যে রাখতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় একফোঁটা জল তার গায়ে পড়ল। সে বলে উঠল, "আশ্চর্যের ব্যাপার! আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, তারাগুলো ঝক্‌ঝক্, চক্‌চক্ করছে। তা সত্ত্বেও বৃষ্টি হচ্ছে! উত্তর ইউরোপের আবহাওয়া খুবই খারাপ। নল বৃষ্টি পছন্দ করত, কিন্তু তা ছিল তার স্বার্থপরতা।"

তারপর আরো একফোঁটা জল পড়ল।

"যদি বৃষ্টিই না আটকায় তবে মুর্তির তলায় আশ্রয় নিয়ে লাভ কি?" সে বলল। "আমি অবশ্যই কোন চিমনির মাথায় আশ্রয় নেব।" এই বলে সে উড়ে যেতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু ডানা মেলার আগেই আরো এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়ল। সে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল – আহ্, সে কি দেখল?

সুখী রাজপুত্রের দু'চোখ জলে ভরে গেছে, আর সেই চোখের জল তার সোনালী গাল বেয়ে নীচে পড়ছে। চাঁদের আলোয় তার মুখখানি এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে ছোট্ট সোয়ালোর হৃদয় করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

"আমি সুখী রাজপুত্র।"

"তাহলে তুমি কাঁদছ কেন?" সোয়ালো জিজ্ঞাসা করল। "তোমার চোখের জলে আমি একেবারে নেয়ে উঠেছি।"

মূর্তি উত্তর দিল "আমি যখন জীবিত ছিলাম এবং আমার যখন মানুষের হৃদয় ছিল, তখন চোখের জল কি জিনিষ আমি জানতাম না। আমি সাঁ-সুচি প্রাসাদে থাকতাম, যেখানে দুঃখের প্রবেশ নিষেধ ছিল। দিনের বেলায় আমি আমার সঙ্গীদের সাথে বাগানে খেলা করে বেড়াতাম। আর সন্ধ্যাবেলায় প্রাসাদের বড় হলঘরে আমাকে ঘিরে বসত নাচের আসর। বাগান ঘিরে ছিল একটা উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরে কি আছে জানার জন্য আমি থোড়াই কেয়ার করতাম। আমার সবকিছুই ছিল খুব সুন্দর। আমার সহচরেরা আমাকে 'সুখী রাজপুত্র' বলে ডাকত। যদি আমোদ-প্রমোদকে সুখ বলা যায় তবে আমি সুখীই ছিলাম। এইভাবে আমি বেঁচে ছিলাম, এইভাবেই আমি মারা গেলাম। আমি মারা যাবার পর আমার মূর্তিটিকে এত উঁচুতে স্থাপন করা হ'ল যাতে আমি শহরের সব কদর্যতা এবং দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাই। এখন আমার হৃদয় যদিও সীসা দিয়ে গড়া, তবু আমি না কেঁদে পারি না।"

সোয়ালো মনে মনে বলল, "তাহলে মূর্তিটা নিরেট সোনার নয়?" সে এত বিনয়ী ছিল যে এরকম ব্যক্তিগত মন্তব্য সে জোর গলায় প্রকাশ করত না।

মূর্তিটি গানের সুরে, খুব মৃদু স্বরে বলে চলল, "দূরে, এখান থেকে অনেক দূরে, ছোট রাস্তার ধারে একটা জীর্ণ বাড়ি রয়েছে। বাড়িটার একটা জানালা খোলা। সেখান দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ঘরের মধ্যে একটা টেবিলে এক মহিলা বসে আছে। তার হাত, মুখ সব রোগা রোগা। মহিলা সেলাইয়ের কাজ করে। সূঁচে বিঁধে বিঁধে তার হাত দুটো লাল, শীর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে একটা সাটিনের গাউনের উপর প্যাশন ফুলের ছবি এমব্রয়ডারি করছে। তাকে এটি করতে দিয়েছে রানীর খাস-চাকরানি, যে ওটি পরের রাজকীয় বলনাচের সময় পরবে। ঘরের এক কোণে বিছানায় একটা অসুস্থ ছোট ছেলে শুয়ে আছে। তার জ্বর হয়েছে এবং সে কমলালেবু খাবে বলে বায়না করছে। কিন্তু তার মায়ের কাছে নদীর জল ছাড়া ছেলেকে দেবার মত আর কিছুই নেই। তাই ছেলেটি কাঁদছে। সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, তুমি কি তাদের কাছে আমার তরবারির হাতলের চুনিটি নিয়ে যাবে? আমার পা দুটো যে স্তম্ভের সাথে আটকানো, তাই আমি নড়তে চড়তে পারিনা।"

সোয়ালো বলল, "আমার বন্ধুরা ঈজিপ্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা নীলনদের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে এবং সেখানকার বড় বড় পদ্মফুলগুলির সাথে আলাপ করছে। শীঘ্রই তারা মহারাজার সমাধি মন্দিরে গিয়ে ঘুমোবে। মহারাজা সেখানে তাঁর চিত্রিত কফিনের মধ্যে শায়িত আছেন। তাঁকে বিভিন্ন ভেষজ মাখিয়ে এমবাম করে হলুদ কাপড়ে মুড়ে কফিনে পুরে রাখা হয়েছে। তাঁর গলায় একটা খুব সুন্দর সবুজ মণির হার। আর তাঁর হাতগুলো শুকনো পাতার মত।"

"সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, তুমি কি আর একরাত্রি আমার কাছে থাকবে না, আমার দূতিয়ালী করবে না? জ্বরের ঘোরে ছোট্ট ছেলেটা খুবই তৃষ্ণার্ত, আর তার মা খুবই দুঃখিত।"

সোয়ালো উত্তর দিল, "আমার মনে হয় না আমি ছেলেদের পছন্দ করি। গত গ্রীষ্মে আমি যখন নদীর ধারে ছিলাম, তখন সেখানে মিলওয়ালার দুটো বদমায়েশ ছেলে এসেছিল। তারা আমার দিকে ঢিল ছুঁড়ছিল, কিন্তু আমাকে আঘাত করতে পারেনি। আমরা সোয়ালোরা খুব দ্রুতগতিতে উড়তে পারি কিনা। তাছাড়া আমি বেশ চটপটে, কর্মতৎপর পরিবারের সন্তান। কিন্তু তবুও ঐ ছেলেদের আমার দিকে ঢিল ছোঁড়াটা ঠিক কাজ ছিল না।"

কিন্তু সুখী রাজপুত্রকে এত দুঃখিত দেখাচ্ছিল যে সোয়ালোও দুঃখিত না হয়ে পারল না। সে বলল, "এখানে খুব ঠাণ্ডা। তবু আমি একরাত্রি তোমার কাছে থাকব এবং তোমার দূতিয়ালী করব।"

রাজপুত্র বলল, "ছোট্ট সোয়ালো, তোমাকে ধন্যবাদ।"

এরপর সোয়ালো রাজপুত্রের তরবারির হাতল থেকে বড় চুনিটা খুলে নিল এবং ঠোঁটে করে নিয়ে শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেল।

সে গীর্জার চূড়ো পেরিয়ে গেল। সেখানে শ্বেতপাথরে দেবদূতদের মূর্তি খোদাই করা আছে। প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে নাচ-গানের শব্দ শুনতে পেল। একটি সুন্দরী মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে প্রাসাদের ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। প্রেমিকটি তাকে বলল, "তারাগুলো কি চমৎকার এবং ভালবাসার শক্তি কি অপূর্ব!" মেয়েটি বলল, "রাজকীয় বলনাচের আগেই আমার গাউনের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি। আমি সেটিতে প্যাশন ফুলের ছবি এমব্রয়ডারি করতে দিয়েছি। কিন্তু এই দর্জি-মেয়েগুলো যা অলস!"

সোয়ালো নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় দেখল সেখানে জাহাজের মাস্তুল থেকে লণ্ঠন ঝুলছে। সে ইহুদি বসতির উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখল বূড়ো ইহুদিরা দরাদরি করছে এবং তামার দাঁড়িপাল্লায় টাকা-পয়সা ওজন করছে। অবশেষে সে জীর্ণ বাড়িটায় এসে পৌঁছাল এবং তার ভিতরটা দেখল। জ্বরের ঘোরে ছেলেটা বিছানায় ছটফট করছিল, আর তার মা এতই ক্লান্ত ছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোয়ালো ছোট ছোট লাফ দিয়ে টেবিলে গিয়ে সেলাইয়ের সরঞ্জামের পাশে চুনিটা রাখল। তারপর সে খুব ধীরে ধীরে ছেলেটির বিছানার চারিদিকে উড়তে লাগল এবং তার ডানা দিয়ে ছেলেটির কপালে হাওয়া করতে থাকল। ছেলেটি বলল, "কি ভালো লাগছে, আমার শরীর এখন ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই এবার সেরে উঠছি।" এই বলে সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর সোয়ালো সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এল এবং যা যা করেছে তা জানাল। সে মন্তব্য করল, "এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এখন ঠান্ডা, কিন্তু আমার বেশ গরম বোধ হচ্ছে।"

রাজপুত্র বলল, "তার কারণ তুমি একটা ভাল কাজ করেছ।" ছোট্ট সোয়ালো চিন্তা করতে শুরু করল এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। চিন্তা করলেই তার ঘুম আসত।

যখন সকাল হল তখন সে নদীতে নেমে চান করে এল।

এক পক্ষীবিদ্যার অধ্যাপক সেতুর ওপর থেকে তাই দেখে মন্তব্য করলেন, "কি আশ্চর্য, শীতকালে সোয়ালো!" তিনি এই নিয়ে স্থানীয় খবরের কাগজে একটা লম্বা চিঠি লিখলেন। অন্য সবাই তার উদ্ধৃতি দিল। তবে তার মধ্যে এমন অনেক শব্দ ছিল যার মানে তারা বুঝত না।

সোয়ালো বলল, "আজ রাত্রে আমি ঈজিপ্ট যাব।" এই যাত্রার সম্ভাবনায় সে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে শহরে যত স্মৃতিসৌধ আছে সেগুলি দর্শন করল এবং একটি গীর্জার চূড়ায় অনেকক্ষণ বসে থাকল। যেখানেই সে গেল সেখানেই চড়ুইপাখিরা কিচির মিচির শুরু করল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "একজন সম্মানীয় আগন্তুক।" তাই শুনে সোয়ালোর খুব আনন্দ হ'ল।

যখন চাঁদ উঠল তখন সোয়ালো সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এল। সে রাজপুত্রকে বলল, "ঈজিপ্টে আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি? আমি এখনই যাত্রা করছি।"

"সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, তুমি কি আর একটা রাত আমার কাছে থাকবে না?" রাজপুত্র বলল।

সোয়ালো উত্তর দিল, "আমার জন্য ঈজিপ্টে সবাই অপেক্ষা করছে। আগামীকাল আমার বন্ধুরা দ্বিতীয় জলপ্রপাতের কাছে উড়ে যাবে। সেখানে জলহস্তী নলখাগড়ার বনে শুয়ে থাকে এবং গ্রানাইট পাথরের একটা বড় সিংহাসনে দেবতা মেমনন বসে থাকে। সারারাত ধরে দেবতা তারা দেখে যায়, আর ভোরবেলায় যখন শুকতারা ওঠে তখন সে আনন্দে চিৎকার করে। তারপর সে চুপ করে যায়। দুপুরবেলায় হলুদ সিংহরা সেখানে জলপান করতে আসে। তাদের চোখগুলো সবুজ মণির মত, আর তাদের গর্জন জলপ্রপাতের গর্জনের থেকেও জোরালো।"

রাজপুত্র বলল, "সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, অনেক দূরে শহরের অন্যদিকে আমি এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি। সে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছে এবং টেবিলে অনেক কাগজ-পত্র ছড়ানো। পাশে একটা পানপাত্রে শুকিয়ে যাওয়া একগোছা ভায়োলেট ফুল রাখা আছে। তার চুলগুলো বাদামি, খড়খড়ে এবং ঠোঁটদুটো আনারদানার মত লাল। চোখদুটো বড় বড় এবং স্বপ্নালু। সে থিয়েটারের পরিচালকের জন্য একটা নাটক লিখে শেষ করতে চাইছে, কিন্তু প্রবল ঠান্ডায় সে আর লিখতে পারছে না। চুল্লীতে আগুন নেই, আর খিদেয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

দয়ালু সোয়ালো বলল, "আমি তোমার কাছে আরো একরাত্রি থাকব। আমি কি ঐ যুবকটির কাছে আর একটা চুনি নিয়ে যাব?"

"হায়! আমার কাছে আর কোন চুনি নেই," রাজপুত্র বলল। "যা আছে তা হ'ল আমার চোখদুটো। সেদুটো দুর্মূল্য নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরী। মণিগুলো হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছিল। তুমি একটা মণি খুলে নিয়ে যুবকটিকে দিয়ে এস। সে জহুরীকে ওটি বিক্রী করে সেই টাকায় খাবার এবং চুল্লীর কাঠ কিনতে পারবে এবং নাটকটি লেখা শেষ করতে পারবে।"

সোয়ালো বলল, "প্রিয় রাজপুত্র, আমি তোমার চোখ খুলে নিতে পারব না।" এই বলে সে কাঁদতে শুরু করল।

রাজপুত্র বলল, "সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, "আমি যা আদেশ করছি তাই কর।"

সোয়ালো তখন রাজপুত্রের একটি চোখ খুলে নিয়ে যুবকটির চিলেকোঠায় উপস্থিত হ'ল। চিলেকোঠার ছাদে একটা ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে সহজেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। যুবকটি দুহাতে মাথা চেপে ছিল। সুতরাং সে সোয়ালোর ওড়ার শব্দ শুনতে পেল না। যখন সে মাথা তুলল তখন ভায়োলেট ফুলগুলির উপর সে সুন্দর নীলকান্তমণিটি দেখতে পেল।

সে বলে উঠল, "এখন লোকে আমার কদর করছে। এটা নিশ্চয়ই আমার কাজের কোন সমঝদারের কাছ থেকে এসেছে। আমি এখন নাটকটা শেষ করতে পারি।" তাকে বেশ সুখী দেখাল।

পরের দিন সোয়ালো বন্দরে গিয়ে একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর বসল। সেখানে জাহাজীরা বড় বড় সিন্দুকগুলো কাছিতে বেঁধে 'হেঁইয়ো, হেঁইয়ো' বলে চিৎকার করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সোয়ালো বলল, "আমি ঈজিপ্টে যাব।" কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না। তারপর যখন চাঁদ উঠল তখন সে আবার সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এল।

সে রাজপুত্রকে বলল, "আমি তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছি।"

"সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, তুমি কি আর একটা রাত্রি আমার কাছে থকবে না?'

সোয়ালো উত্তর দিল, "দেখ, এখানে এখন শীত, শীঘ্রই বরফ পড়বে। ঈজিপ্টে রোদে পাম গাছের উপরগুলো বেশ গরম। সেখানে কাদায় কুমীরগুলো অলসভাবে শুয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আমার বন্ধুরা সেখানকার বালবেক মন্দিরে বাসা তৈরী করছে। আর তাই দেখে সাদা এবং গোলাপী রংয়ের ঘুঘুরা 'ঘুঘুর ঘুঘ' বলে ডাকাডাকি করছে। আমার প্রিয় রাজপুত্র, আমাকে এখন যেতেই হবে। তবে আমি তোমাকে কখনই ভুলব না। তুমি যে দুটো মণি বিলিয়ে দিয়েছ তার

বদলে আগামী বসন্তে আমি তোমাকে আরো দুটো সুন্দর মণি এনে দেব। চুনিটা হবে লালগোলাপের চেয়েও বেশী লাল, আর নীলকান্তমণিটা মহাসাগরের মতই নীল।"

সুখী রাজপুত্র বলল, "নিচের চত্বরটায় একটা ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ওখানে দেশলাই বিক্রী করে। কিন্তু তার দেশলাইগুলো সব নর্দমায় পরে নষ্ট হয়ে গেছে। দেশলাই বিক্রীর টাকা সে বাড়ি নিয়ে যেতে না পারলে তার বাবা তাকে মারবে। তাই সে কাঁদছে। তার পায়ে জুতো-মোজা কিছুই নেই। মাথাটিও আঢাকা। তুমি আমার অন্য চোখটি খুলে নিয়ে মেয়েটিকে দিয়ে এস। তাহলে তার বাবা আর তাকে মারবে না।"

সোয়ালো বলল, "আমি না হয় তোমার কাছে আরো এক রাত্রি থাকব, কিন্তু তোমার অন্য চোখটা খুলে নিতে পারব না। ওটা খুলে নিলে তুমি যে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাবে।"

রাজপুত্র বলল, "সোয়ালো, সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, "আমি যা আদেশ করছি তাই কর।"

সুতরাং সোয়ালো রাজপুত্রের অন্য চোখটিও খুলে নিল এবং দ্রুত নিচে নেমে মেয়েটির হাতে সেটি ফেলে দিল।

"কি সুন্দর একটা কাঁচের টুকরো!" মেয়েটি আনন্দে চিৎকার করে উঠল এবং হাসতে হাসতে ছুটে বাড়ি চলে গেল।

এরপর সোয়ালো রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বলল, "তুমি এখন অন্ধ হয়ে গেছ। সুতরাং আমি সবসময় তোমার কাছে থাকব।

রাজপুত্র বলল, "না, ছোট্ট সোয়ালো, তুমি অবশ্যই ঈজিপ্ট যাবে।"

সোয়ালো বলল, "না, না, আমি সবসময় তোমার কাছেই থাকব।" এই বলে সে রাজপুত্রের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সোয়ালো রাজপুত্রের কাঁধে চড়ে বসল এবং বিদেশে যা সব দেখেছে তার গল্প করতে লাগল। লাল রঙের সারসেরা তাদের লম্বা, বাঁকা ঠোঁট দিয়ে সোনালী মাছ ধরবে বলে নীলনদের ধার বরাবর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে – তার গল্প করল। মরুবাসী, সবজান্তা, আদ্যিকালের স্ফিংসের কথা বলল। হাতে বাদামি রঙের পুঁতির মালা নিয়ে সওদাগরেরা তাদের উটের পাশে পাশে ধীরে ধীরে হেঁটে যায়; চাঁদের পাহাড়ের আবলুস কাঠের মত কালো রাজা একটা স্ফটিককে পূজো করে; সবুজ রঙের বড় একটা সাপ পামগাছে ঘুমোয় এবং কুড়িজন পুরোহিত তাকে মধুভরা কেক খাওয়ায়; পিগমিরা বড় একটা পাতায় চড়ে বড় হ্রদ পাড়ি দেয়, তাদের সঙ্গে প্রজাপতিদের সর্বক্ষণের ঝগড়া। এইসব গল্প সে রাজপুত্রের কাছে করল।

রাজপুত্র বলল, "প্রিয় ছোট্ট সোয়ালো, তুমি আমাকে অনেক বিস্ময়কর জিনিষের কথা বলছ। কিন্তু অন্য যে কোন জিনিষের থেকে আরো বিস্ময়কর হল নর-নারীর দুর্ভোগ। দুঃখ-দুর্দশার চেয়ে বড় রহস্য আর কিছু নেই। ছোট্ট সোয়ালো তুমি আমার শহরের উপর উড়ে যাও, আর কি দেখলে তা আমাকে বলবে।

সুতরাং সোয়ালো বড় শহরটির উপর উড়ে বেড়াল। সে দেখল ধনীরা তাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় আনন্দ করছে আর ভিখারীরা সেই অট্টালিকার দরজার সামনে বসে আছে। সে অন্ধকার গলির মধ্যে উড়ে গেল আর দেখল ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের ফ্যাকাসে, বিষণ্ণ মুখ। সেতুর নিচে দুটো ছেলে জড়াজড়ি করে শুয়ে ছিল। এইভাবে তারা তাদের শরীর গরম রাখার চেষ্টা করছিল। তারা বলছিল "আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।" পাহারাদার এসে বলল, "এটা তোমাদের শোবার জায়গা নয়, ভাগো এখান থেকে।" এই শুনে তারা বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল।

তারপর সোয়ালো রাজপুত্রের কাছে ফিরে গেল এবং যা যা দেখেছে বলল।

রাজপুত্র বলল, "আমার শরীর সুন্দর সুন্দর পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। তুমি এই পাতগুলো একটা একটা করে খুলে নিয়ে গরীবদের দিয়ে এস। জীবিতেরা সব সময় ভাবে যে সোনা পেলে তারা সুখী হবে।

সোয়ালো তাই করল। একটা একটা করে সেই সুন্দর সোনার পাতগুলো রাজপুত্রের শরীর থেকে খুলে নিল। তাতে রাজপুত্রকে খুবই ম্যাড়মেড়ে এবং ধূসর দেখতে হ'ল। সোয়ালো একটা একটা করে সেই সোনার পাতগুলি গরীবদের দিয়ে এল। এতে বাচ্চাদের মুখগুলি খুশীতে গোলাপী হয়ে উঠল এবং তারা হেসে আনন্দে রাস্তায় খেলে বেড়াতে লাগল। তারা চিৎকার করে বলল, "আমরা এখন রুটি খেতে পাব।"

এরপর বরফ পরতে শুরু করল। সেগুলো জমাট বাঁধায় রাস্তাগুলো খুব সাদা আর চকচকে হয়ে গেল। বড়ির কার্নিস থেকে জমাট বাঁধা ঝুলন্ত বরফ দেখলে মনে হ'ত সেগুলো যেন স্ফটিকের ছুরি। সবাই ফারের পোষাকে নিজেদের আবৃত করল এবং বাচ্চারা লাল টুপি পরে বরফের উপর স্কেটিং করতে লাগল।

ছোট্ট সোয়ালো বেচারির আরো বেশী করে শীত করতে লাগল। কিন্তু সে রাজপুত্রকে এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে তাকে ছেড়ে গেল না। যখন পাঁউরুটি-ওয়ালা দেখত না তখন তার দরজার সামনে পড়ে থাকা পাঁউরুটির খুব ছোট ছোট টুকরোগুলো সোয়ালো খুঁটে খুঁটে খেত। আর ডানা ঝটপটিয়ে সে নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা করত।

কিন্তু সে বুঝতে পারছিল যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তার শরীরে শুধু একবার মাত্র উড়ে গিয়ে রাজপুত্রের কাঁধে বসার মত শক্তি ছিল। সেখানে বসে সে অস্ফুটস্বরে বলল, "বিদায় রাজপুত্র। তুমি কি আমাকে তোমার হাতে চুমু খেতে দেবে?"

রাজপুত্র বলল, "ছোট্ট সোয়ালো, আমি আনন্দিত যে তুমি শেষ পর্যন্ত ঈজিপ্টে যাচ্ছ। তোমার এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার ঠোঁটে চুমু খাও।"

সোয়ালো বলল, "আমি ঈজিপ্টে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি মৃত্যুপুরীতে। মৃত্যু তো নিদ্রারই ভাই, নয় কি?"

এই বলে সে রাজপুত্রের ঠোঁটে চুমু খেল এবং রাজপুত্রের পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল।

ঠিক সেই সময় মূর্তির ভিতরে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হ'ল – যেন কোন কিছু ভেঙ্গে গেল। ঘটনা হ'ল যে মূর্তির সীসার হৃৎপিণ্ডটি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল।

পরদিন খুব সকাল সকাল শহরের মেয়র নগর পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে নিচের চত্বরটায় হাঁটছিলেন। স্তম্ভটার পাশে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হায় ভগবান! সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটা কি বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে!"

পারিষদরা যারা সবসময়ই মেয়রের কথায় সায় দিত, তারা বলল, "সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটা কি বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে!" আরো ভাল করে দেখতে তারা স্তম্ভের উপরে উঠল।

পারিষদেরা বলল, "ভিক্ষুকেরও অধম।"

মেয়র বলে চললেন, "দেখছি, মূর্তির পায়ের কাছে একটা পাখি মরে পড়ে আছে। আমরা অবশ্যই একটা আদেশ জারি করব যে এখানে কোন পাখির মরা চলবে না। পারিষদ দলের কেরাণীটি তা লিখে নিল।

তারা স্তম্ভের উপর থেকে সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটি নামিয়ে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক বললেন, "মূর্তিটি যেহেতু আর সুন্দর নয়, তাই ওটি আর কোন কাজেরও নয়।"

ধাতু গলানোর চুল্লীতে মূর্তিটি গলিয়ে ফেলা হ'ল। ধাতুটা নিয়ে কি করা হবে তা ঠিক করার জন্য মেয়র নগর পরিষদের একটা মিটিং ডাকলেন। তিনি বললেন, "আমরা ওখানে অবশ্যই আর একটা মুর্তি বসাবো, আর সে মূর্তিটি হবে আমার।"

নগর পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল, "না, ওখানে আমার মূর্তি বসানো হবে।" এই নিয়ে তাদের মধ্যে জোর ঝগড়া লেগে গেল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ঝগড়া করেই চলছিল।

ধাতু গলানোর কারখানার ওভারসীয়ার বলল, "কি আশ্চর্য! সীসার ভাঙ্গা হৃৎপিণ্ডটি চুল্লীতে কিছুতেই গলছে না। এটাকে ফেলে দিলেই হয়।" এই বলে সেটিকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই আস্তাকুঁড়ে মরা পাখিটিও পড়ে ছিল।

ভগবান তাঁর দেবদূতদের একজনকে বললেন, 'শহর থেকে আমাকে সবচেয়ে মূল্যবান দুটো জিনিষ এনে দাও। দেবদূতটি সীসার হৃৎপিণ্ড এবং মরা পাখিটি নিয়ে এল।

ভগবান দেবদূতকে বললেন, "তুমি ঠিক জিনিষই এনেছ। এই ছোট্ট পাখিটি আমার স্বর্গের বাগানে চিরদিন গান গাইবে। আর আমার সোনার শহরে সুখী রাজপুত্র আমার বন্দনা করবে।

****

বলে যেও

দেবাশিস মজুমদার[13]

তোমার স্বচ্ছন্দ চলাচল
তোমার ধামসা মাদল
প্রতি মুহূর্তের বিমুগ্ধ লয়
সাথে নিয়ে সব একবার
বলো গলা ছেড়ে আরবার
হারিয়েছে যা কিছু
গেছে যে দিন
রিক্ত রক্তাক্ত করে তোমায়
যন্ত্রণার বিমূর্ত চেতনায়
তার আড়ালে পড়ে থাকা
একমুঠো জীবন

একফালি প্রাণ
আবার চোখ মেলে
মাত্রাবৃত্তের মায়া ছেড়ে
এক অচেনা অমিলের
মুক্ত শাশ্বত সুরে
দুদণ্ড বুকভরা শ্বাস নেবে
পৃথিবীকে বলে যাবে
নেইরাজ্যের পাড়ে
এখনও সূর্য ওঠে
এখনও অজানা ছন্দ
পাখা মেলে ওড়ে

[13] কবি কলকাতাবাসী অর্থনীতির অধ্যাপক। এই কবিতা দিয়েই 'অঙ্কুর'এ তাঁর প্রথম প্রকাশ।

বৈরাগীর গান

অমল সান্যাল[14]

মুখপোড়া মন তোর জ্বালাতে/ ম'লাম আমি জ্বলে পুড়ে;
লক ডাউনটা উঠে গেলেও/ থাকবি আমার ছ' ফুট দূরে।
তুই যা বুঝালি/ তাই বুঝেছি,
দেখালি যা/ তাই দেখেছি,
এবার দূর হয়ে যা, গান গাইবো/ গুরুর দেওয়া সহজ সুরে।

তোর চালাকিতে সব ভুলেছি/ আমি যে কে তাও ভুলেছি,
এই শুনে রাখ ভুলছিনা আর/ এবার আমি জট খুলেছি।
তুই ঘেঁষলে কাছে/ মাস্ক প'রবো,
সাবান ঘ'ষে/ দুহাত ধোবো,
তোর কথা শুনে বেবাক ঠ'কে/ এবার আমি কান মলেছি।

গুরুর দেওয়া সুরের দোলা/ থেকে থেকেই মারছে ঠেলা,
সেই সুরেতেই গান ধরবো/ উঠবে ভ'রে সারা বেলা।
যথেচ্ছা তুই/ বেড়া ঘুরে,
কিন্তু ছ'ফুট/ দূরে দূরে;
একলা ঘরের লক ডাউনে/ সুর মেলাবো গুরু চেলা।

****

Go away! Corona Go away! (ভাগ! করোনা ভাগ!)
Drawn by Ruheli Chatterji – a year 5 Wellington student

[14] পদকর্তার পরিচিতির জন্য 'চাঁদগাঁয় ভুত চতুর্দশী' কবিতার পাদটীকা দেখুন।

Down the Memory Lane

Sucharita Sen[15]

ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে
সবাই আমার মত বড় হয়ে যায়
জানিনা ক'জনে আমার মতন
মিষ্টি সে পিছু-ডাক শুনতে যে পায়

My mother wanted me to be a Sunday child. When I finally arrived in this world on a Sunday evening, my father found his little princess. From my very first days on this planet, my voice knew no bounds. The walls of the hospital reverberated with my incessant screams, perturbing my family, who were too upset that the nurses were not catering to my demands. What my demands were, however remained unknown. In every probability, I had no other work, so why not spend the time howling my heart out.

My grandfather named me 'Sucharita'. His first instruction to his beloved daughter was 'make sure she has a good character'. True to the literal meaning of this name, coupled with the influence of Rabindranath Tagore's characterization of the female protagonist 'Sucharita' in his celebrated novel, *Gora*, my family always had high expectations from me.

I was never a pampered child. Scolding and what people in common parlance would say *kil-chor-thappor* was a regular feature in my life. Yet, I never had any discomfort. I had everything I could ever ask for. My favourite knitwear made by my grandmother, my favourite delicacies cooked by my mother and my grandmother and toys and puzzles gifted by my father, I had everything which made me feel like a princess of my kingdom.

Reading had always been my favourite hobby. My earliest memories are of children's classics and moral stories presented to me by my grandfather and my mother. Life was never monotonous and perennially secure for I was always surrounded by an armour of inexhaustible love. Nestled in the laps of my grandmother, listening to ghost stories had always been an indispensable delight. Family tradition had to be unerringly perpetuated; my parents trained me in singing for that had been in my family for generations.

Evening fairs had been a source of regular entertainment. Those evenings with huge balloons, dry *phuchkas*, only to wonder how that reddish water might taste, teary-eyed demands to be allowed on the very appealing roller-coaster, though in vain – always occupied a major portion of my childhood nostalgia.

My earliest days were spent in the foothills of the Bhutan Mountains, thanks to my father being posted as an officer in one of the remotest villages of Bengal. No electricity, no transportation, interminable rains, unabating storms, massive floods coupled with foxes and hyenas paying nocturnal visits to the neighbourhood characterised life in the area. Yet, my parents made sure that their daughter's education should not be hampered. My mother transformed one entire room of out cottage into a classroom. The walls of the room hosted numerous charts, in their endeavour to familiarize me with alphabets, numbers, tables, animals, birds, plants and flowers.

[15] Sucharita hails from Kolkata and currently is pursuing her doctoral studies at the Victoria University of Wellington, NZ.

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

I always considered myself to be fortunate to have been born to working parents. From them, I learnt the principle of sharing responsibilities. My home did not have an air-tight division of labour. I saw my mother being economically independent and my father sharing dutifully in the household chores.

After relentless efforts, my parents returned to Kolkata, only for the sake of my education. From evenings when my house would look like a ground ravaged by the rampage of a riot to loving memories of outings and adventures, I grew up too fast. Spearheading my career, what I am today is the grace of my parents and my grandparents. Those days had been times of tranquil happiness, delightful memories and sweet nostalgia.

Often, I remember a song,

Mother of mine, now I am grown
And I can walk straight all on my own,
I'd like to give you, what you gave to me,
Mother, sweet mother of mine.

In India, daughters are considered to be others' property. Often, I found questioning myself – is it possible to return, as the stanza says, 'what you gave to me'? Abstracting myself from every feminist or humanist scholarship that I may have been exposed to, still my answer would be, 'certainly not'. Despite being an avowedly devoted Hindu girl, my utmost dislike for certain rituals of Hindu marriage stems from these thoughts of mine.

Today, when I am in another part of the world, I resort to technological assistance to bridge the gap with my family. My personal experience taught me that gap is never physical, it is always psychological and emotional. Even staying close to parents, living under the same roof, children might have a huge generation gap with parents. And even after staying far away, children can remain close to their parents, retaining the same love and affection. For I know that even if the world shuns me, I will find my parents beside me; and herein lies to secret key to my strength.

****

'The Dancing Dolphin' by Shriya Dutta, a year 8 Wellington student

Greg Hawkins – my neighbor

Dilip Kumar Das[16]

Soon after moving into my present address in early February 2001, I got acquainted with Greg-Gregory Richard Hawkins, my neighbor. On the west of my house is the main road of the neighborhood, there are three neighbors on the three other sides. Greg is on the eastern side. Gradually, I got acquainted with the other neighbors as well. In the close to two decades, many new neighbors have come and gone from the northern and southern sides. This is quite common in New Zealand. When the family consists of only a couple, they usually go in for a small rented accommodation or a small house. When children start arriving they go for a larger house – whether rented or their own. When the children move out of the nest, the parental home, usually the house is down-sized. And then in their ripe age, the destination of many is the retirement village or a rest home. This is a common pattern, but there are exceptions. It is not unusual to see a family – be it small or large – in the same house for 30-40 years or more. Greg, nearly 58 years old, is one such person. He is living in his current home for 24 years. His eldest son has already left the nest, the daughter is at a university in a different city, and the youngest son lives with him. The father of Greg's father-in-law went to India for work and was posted at a place called Jhansi. Greg's father-in-law was born there. So, the family named their daughter 'Jhansi'!

My house is on the slope of a hill. There are lawns in the front and back with also a small flower garden on the front. On the back side near the fence, there were shrubs and small trees. I thought of developing a small kitchen garden there. So, on a weekend, I started cutting some of the trees with a hand-saw and an axe. Seeing that from the other side of the fence, Greg said, "The way you are cutting the trees with hand tools, it will take long time to clear the area of trees and shrubs and remove their stumps."
"So, what is the solution?" I asked.
"If you wish, I can cut down the trees with my chain-saw. You can then remove the stumps in your own time," Greg replied.
I agreed to his suggestion, and he cleared the area within a couple of hours. The next step was to build a retaining wall and a compost-bin. I contracted Greg to do these jobs.

Professionally Greg was an outdoor handyman doing 'almost anything and every outdoor work in one's property'. He used to do all sorts of work such as landscaping, fence building, retaining wall making, developing lawn and its maintenance, gardening, etc. For this, he had established a private company called "Backyard Buddy" and equipped with necessary tools in a van he used to go to work all over the wider Wellington Region. However, a few months ago, he left that job and does something else now. I'll come back to that later.

Greg is a tall, strong and stout man. His body is suitable for hard physical work. Both Maori and European blood is flowing through his body. However, he prefers to describe himself as a Maori. His European connection is evident from his surname 'Hawkins'. I heard stories from him how the Europeans used to suppress Maoris even up to a few decades ago. When his father was a school-boy they were not allowed to speak Maori language at school. If they did, they were beaten. The situation has been changed now. Now a days, Maori language and culture are

[16] I am a Wellington-based public health doctor and the editor of two New Zealand based mainly Bengali magazines 'Ankur' and 'Boishakhee'. This article is the English translation of the original one in Bengali. Thanks to Mr. Aroop Takyar for reviewing and editing it – Author.

promoted by the New Zealand government. Maori is one of the official languages in New Zealand. The other two are English and New Zealand sign language.

My friendship with Greg deepened gradually. If we went away from our home for a week or two, I would request Greg to keep an eye on our house and water the plants in our garden if there were no rains for a few days. I also did the same for them if they were away for a short time. If we went for a longer holiday of say, one month or more, we would arrange for a house-sitter. With this arrangement the house-sitter would stay free in our home and look after it.

Greg has a hot house. Hot house is a shelter in the garden made of glass or transparent plastic sheets for small plants. The temperature, humidity etc. in it could be controlled, and the plants do not get stressed in cold. Once when the Hawkins family was away I went to water the plants in their hot house and noted that a stereo was hanging from the ceiling of it. When they returned, I asked Greg about the stereo. He said that he was exposing the plants to music with that. He thought that the plants would be happy with music and they would love it. This reminded me of my class-mate Manas – Manasnath Bandyopadhyay in Medical College, Calcutta. Manas was a budding scientist, and though a medical student his real interest was in botany. He used to do various scientific experiments on plants. One such experiment was the effect of music on plant growth and their chemico-physical responses. Even when we were first or second year MBBS students, many PhD candidates of botany used to consult Manas for guidance and advice. I found that Manas and Greg had one thing in common. Both were plant lovers. Manas used to expose plants to music for scientific research – he was a scientist. However, Greg is a Joe Public. It occurred to him that if he played music to plants, they would love it. So, he arranged that!

One day Greg told me that he would like to grow egg plants in his hot house, and asked me how we Indians cooked/ate this vegetable. I told him that egg plants could be cooked in many ways, such as light or deep fry in oil, roast which can be smashed with other roasted vegetables, different types of curry with other vegetables, etc. However, my favorite eggplant dish is called ‘Beguni’. Greg asked exactly what that was and how did we make it? Noticing his interest in Beguni, I invited him to the afternoon tea next Sunday. In addition to drinking tea with puffed rice and Beguni, my wife showed him how to make Beguni from the beginning to the end! For the information of readers, Beguni is made by deepfrying in oil thin slices of egg plant smeared with pea-flour batter.

When I bought my house, there was no fence on the front side of it facing the road. A few years ago, we decided to put a fence and a gate on that side. So I asked Greg whether he could be contracted to do the job. He said, “No, you would be able to do it yourself, and I would help you as and when needed.” So, inspired by Greg, I decided to put up the fence with his help. Over the years, I developed some handyman’s skills, often with guidance from Greg. So, he is my ‘guru’ in this regard. I finished building the fence with Greg’s help over the next Christmas-New Year holiday period. In the attached picture, Greg is standing on our driveway-entry by the side of the partially visible fence.

Some months ago, Greg told me that he had left his previous job and was doing something else. I asked him what was that ‘something else?’ He said that he had started mentoring ‘gone astray children’ and counseling them and their families, particularly Maori children.

The New Zealand government is very keen to bring these children back to decent lives, so that they could grow up to be useful, productive citizens. Many of these children come from dysfunctional families and they have no appropriate role model to follow. Greg is a mentor and

a role model for them. In this regard his qualification includes experience as a successful dad, and a respectful position in the local Maori community. In Maori parlance, this is called ‘Mana’. Moreover, for this job Greg in now undertaking an online Maori social study course over the weekends. Often, he attends online classes via ZOOM. Though there is no formal retirement age in New Zealand, people prepare for it, Greg is exploring the new horizons of work. This is Greg, this is New Zealand.

In another Wellington based magazine named ‘Boishakhee,’ edited by me two similar articles were published earlier this year – one relating to mentoring a black child in America and another one describing the life of a West Indian teenager in the UK coming back to normal life. Both these articles were written by authors in Bengali based on their real life experiences. (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxib2lzaGFrZWVuZXd6ZWFsYW5kfGd4OjQ2YjI1YjUzOGYyMTc2MA)

So, this is my neighbor Greg. We try to publish in each year in both the magazines one or two biographies of famous Bengali people. I thought it is also important to publish some aspects of the life of a common man like Greg and here is it.

Gregory Richard Hawkins

আইভি

পবিত্র কুমার মানী[17]

Class 3-র বার্ষিক পরীক্ষার পর যখন রেজাল্ট বেরোল তখন দেখলাম আমি প্রথম হয়েছি। খানিকটা আশ্চর্য হলাম। এটা তো আইভির হওয়ার কথা। বরাবর ফার্স্ট হয়। আমি তো হই না। সেদিন আমি বুক ফুলিয়ে ক্লাসে গেলাম। দেখছি ও খুব চুপচাপ। কোনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে যেন। অক্রুরমণি বিদ্যালয় আমাদের বাড়ী থেকে খুব কাছে। হেঁটে যেতে পারবো। বাবা সেজন্য আমাকে আর বোনকে একই ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ওখানে অনেক অ-সমবয়সী ছাত্র-ছাত্রী পড়ত। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অপূর্ব কুমার। এ ছাড়া প্রবোধ, ধলেশ্বর, জয়া, আভা এরাও পড়তো। তবে এরা সব আমার চেয়ে বয়সে বড় । শুধু আমি, আইভি, আমার বোন ও অপূর্ব সমবয়সী। প্রতিদিন স্কুলে যাই। দিদিমণিরা আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। হাফ-ইয়ারলী পরীক্ষায় আমি আবার প্রথম হলাম। ক্রমশই দিদিমণিদের নয়নের মণি হয়ে উঠছি। আইভি দেখলাম আস্তে আস্তে আমাকে মেনে নিতে শুরু করলো। আর আমি দু চোখ ভরে ওকে আড় চোখে দেখতাম আর মনে মনে উপভোগ করতাম। বেশী কথা বলতাম না। হয়তো অবচেতন মনে ও কখন যে রেখাপাত করে গেছে জানি না। বার্ষিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে চলে গেলাম মালদা জিলা স্কুলে। পুরোনো বন্ধুরা অক্রুরমণিতেই রয়ে গেলো। পরিচিত মুখের দেখা বন্ধ হয়ে গেলো।

কালক্রমে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাস করে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। উঠলাম রমন হলে। আমরাই প্রথম ব্যাচ। রুমমেট পেলাম সন্দীপন আর দিলীপকে। ওরা এসেছে ত্রিপুরা থেকে। ওদের সারল্য আমাকে বেশি টানতো। সন্দীপনের দাদা একবার এসে একটা দামী SLR ক্যামেরা দিয়েছিল ভাইকে। সে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বন্ধুদের আনাগোনা। মলয়, শুভেন্দু, পার্থ পাল এদের আগ্রহ অসীম। দাদা ONGC-র ইঞ্জিনিয়ার। ভাই বুক ফুলিয়ে মোহনপুরে ছবি তুলে বেড়াতে লাগলো। আশেপাশের কোয়ার্টারে কেমন করে যেন খবরটা পৌঁছে গেলো। ক্যামেরার সুবাদে সন্দীপন প্রচুর মাসী, কাকী, বৌদি, বোন, ও সুন্দরী যুবতীদের মন জয় করে নিলো। একদিন বিকেল বেলায় দেখলাম একঝাঁক বিভিন্ন বয়সী মহিলা সন্দীপনের কাছে বেড়াতে এসেছে। আমি আর দিলীপ রয়েছি। দিলীপ অনেক দিন ধরেই স্বপ্নার সাথে প্রেম করে। আমি এসব কিছুই জানি না। ঘরে আমি একদম কোণঠাসা। চিলেকোঠার দিকে তাকিয়ে আছি। আর ভাবছি কখন এরা যাবে। একজন আওয়াজ দিলো আচ্ছা উনি কি ভীষণ গম্ভীর। সন্দীপন সাথে সাথে ব্যাপারটা সামলে নিয়ে বললো উনি পড়াশোনা নিয়েই থাকেন। এর বাইরে কিছু ভাবেন না। কোনও রকমে প্রেস্টিজ বাঁচলো।

শিক্ষা দুর্বার গতিতে এগুতে থাকলো। কাল ক্রমে MSc, PhD করলাম। জুনিয়ার বন্ধুদের খুব হিংসা মনে। আমি ততদিনে Young Scientist Award, Best PhD Thesis Award পেয়েছি। কৃষি দপ্তরের ADO চাকরিও পেয়েছি। গাইড বললেন তুমি কি এই চাকরিটা করবে? একটু ধৈর্য্য ধরো। এখানেই তোমার সম্ভাবনা আছে। অতএব প্রতীক্ষা চলতে থাকলো। ক্যান্টিনে গেলে বন্ধুরা আওয়াজ দিতো 'জিনা ইঁহা, মরনা ইঁহা'। আমি তখন চাকরি পাবার জন্য সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী। সবাই আমাকে মিষ্টি কথায় দূরে ভাল চাকরি নিয়ে যেতে বলে।

[17] লেখক কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-রসায়ন এবং মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

PhD করার কিছু দিন পরে IIT, Kanpur-এ যাই, ওখানে ডিপার্টমেন্ট অফ আর্থ সায়েন্সে fly ash নিয়ে গবেষণা করতে। ওখানে আবার দেখা পেলাম ছোটবেলার বন্ধু অপূর্ব কুমারের। বেঁটে, ফর্সা, মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ও আমাকে সন্ধ্যেবেলায় ওর অ্যাপার্টমেন্টে ডাকলো। আমি উঠেছিলাম এক গবেষক হোস্টেলে। সন্ধ্যেবেলায় ওর সাথে গল্প শুরু হলো। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম আইভির কোন খবর আছে? ওর কি বিয়ে হয়েছে? অপূর্ব তখন সলজ্জ মুখে বললো তোকে একটা কথা বলবো বলেই ডেকেছি। আইভির সাথে আমি গাঁটছড়া বেঁধেছি। মনটা ব্যথিত হয়ে উঠলো। শেষে কিনা আমি বাদ। আইভির একি অপূর্ব-সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মুখে বললাম সেলিব্রেট কর। অ্যাপার্টমেন্টে বসেই সেলিব্রেশন হলো। মনের কোণে হতাশা জমে উঠলো। হায় রে! জগতে একজনকেই চিনতাম এই আশায় যে শেষ পাড়ানির কড়ি দিয়ে সে ভালবাসার বৈতরণী পার করে দেবে। তার বদলে এই হলো !

জীবন এক বহতা নদী। জীবনের বিচিত্র গতিপথে ঘুরপাক খাচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে জীবনে শ্রী ফিরে এলো। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেলাম দেবশ্রীকে। সুখের সংসার। একটি ফুটফুটে সন্তানের জন্মে জীবন আরো বেশি মাধুর্যময় হয়ে উঠলো। জীবনের বিচিত্র গতিপথে আনন্দে ভাসতে থাকলাম।

একদিন খাট সরাতে গিয়ে কোমরে চোট পেলাম। কোনো ওষুধে সারছে না। বন্ধুরা বললো তুই ডাঃ গুপ্তর কাছে যা। উনি ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। উনি দেখে আমাকে দিলেন Ivy 30 । নামটা পড়ে ডাক্তারবাবুকে বললাম ওষুধটার নাম কি। উনি বললেন Ivy। আমাকে বললেন একুশ দিন খাবেন, আশা করি ব্যথা কমে যাবে। ফলও পেলাম অবর্থ্য। এর কিছু দিন পরে অনুভব করি অনেকক্ষণ একটানা কাজ করার জন্য শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়। অর্থোপেডিক দেখাই, এক্সরে করাই, কিন্তু কাজ হয় না। শেষে ডাঃ গুপ্তর কাছে যাওয়া ঠিক করলাম। সব শুনে উনি আমাকে ওষুধ দিলেন। দেখি Ivy 200 দিয়েছেন। আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করলাম ব্যথা গায়েব। আস্তে আস্তে ডাঃ গুপ্ত আমার জীবনে ধন্বন্তরি হয়ে উঠলেন। আবার কিছু দিন পরে দেখছি বাঁ পায়ে বেশ টান লাগছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। সুতরাং কালবিলম্ব না করে ডাঃ গুপ্তর কাছে গেলাম। উনি সব শুনে আমাকে ওষুধ দিলেন। প্রেসক্রিপশন দেখে চমকে উঠলাম। ওষুধের নাম আবার Ivy । মনে মনে ভাবছি উনি কি হোমিওপ্যাথি করেন, না কি মনোচিকিৎসা করেন। মনের গহীনে কার কি ব্যথা লুকিয়ে আছে সেটা হয়তো টের পান।

জীবন চলে গিয়েছে কুড়ি কুড়িটা বছরের পার। মনে নানা রকম খটকা লাগে। ভাবি Ivy কি আমার জীবনের একমাত্র ওষুধ। গিন্নি বলে তুমি আইভিকে পাওনি, কিন্তু ও তোমাকে ছাড়েনি। শৈশবের আইভি ছিল মনের ওষুধ। প্রৌঢ় বয়সের Ivy আমার দেহের ওষুধ। এর মধ্যে বিধাতার কি কোনো অলিখিত ব্যঞ্জনা আছে? কে জানে? কোনো এক কবির চোখে ধরা দিলো না বলেই হয়তো এর অব্যক্ত মাধুর্য প্রকাশ পেলো না। ওষুধ খাই আর মনে মনে গুন গুন করি 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে, হারাই বারে বার'।

(এই গল্পের নাম, চরিত্র সবই কাল্পনিক। বাস্তবে যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তবে তা কাকতলীয়।)

আকাশ মিছিল

রুমকী মজুমদার[18]

নীল আকাশের অন্তরালে হাজার তারার ঝিকিমিকি
নিচে পৃথিবীর মাটিতে তার স্পর্শ বারংবার
অগণিত নক্ষত্রের অন্তরালবাসী পৃথিবী কি সবাক্
অগণিত মানুষের মিছিলে সেই প্রশ্ন একাকী
আকাশ তারার মিছিলে মানুষের সম্মিলন এক দিক্‌দর্শন
জনপথে এই ভিড় কি সমাহিত হয় শুধু কৌশলে?
এছাড়া মানুষ চেনবার উপায় কোথায়?
তীর্থযাত্রীরা ভিড় করেছে আকাশতলে
হোমাগ্নির আগুন থেকে জেগে ওঠা নক্ষত্র
নিতান্তই জমাখরচের হিসেব কষে নয়
আদিগন্ত পৃথিবীর গহ্বরে সমাসীন
এ কোন সময় যা নক্ষত্রের হিসেব জানেনা
জমে থাকে পূঞ্জীভূত ব্যথার নিঃশ্বাসে।

ঢাকের বোলের তালে তালে, দুর্গাপূজো এলো বলে।
অঙ্কনে - সন্নীভ পাল (ওয়েলিংটনের স্কুলে ইয়ার ৩-এর ছাত্র)

[18] রুমকী মজুমদার দীর্ঘদিনের ওয়েলিংটন অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি কালে-ভদ্রে কবিতা লেখেন।

লঙ্কাকাণ্ড

গৌতম সরকার[19]

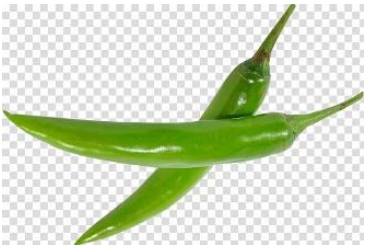

ইউরোপ, অ্যামেরিকা, বা অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘোরার পর রাজস্থানের পুস্করে এসে মনে হোলো যে এর মতো জায়গা পাওয়া দুষ্কর! 'রাজস্থান' নামটা শুনলে (মায় 'ভারতবর্ষ' নামটাও!), আমি আমার মানসচক্ষে যা দেখতে পাই তা হোল একটা 'রত্ন-ভাণ্ডার' বা প্রকারান্তরে একটা 'জুয়েলারি-বক্স'; তবে বেশ নোংরা, এই যা! তা জুয়েলারি-বক্সেও ধুলো পড়ে বৈকি!

রাজস্থানের আনাচ-কানাচ বা সর্বত্রই যেন মণি-মুক্তো খচিত। এই প্রাসাদ, তো সেই কেল্লা; এই মন্দির, তো সেই সমাধি; এই হ্রদ, তো সেই দীঘি – সর্বত্র ছড়ানো। আর আছে হরেক রকম সংস্কৃতি, যা বদলে যায় থেকে থেকেই, কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর। আর এইসবের কিছুই যদি পছন্দ না হয়, তাহলে শুধু যেতে হবে পূব থেকে পশ্চিমে, আর দেখা যাবে সবুজের সমারোহ কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে রুক্ষ মরুভূমিতে। এ হেন রাজস্থানেই আবার পাওয়া যায় আর একটা জিনিস - 'লঙ্কার-তরকারি'।

লঙ্কা তো আমরা ভারতীয়-উপমহাদেশের লোকেরা কম-বেশী সকলেই খাই; এই ফোড়নে বা সেই তরকারিতে, এই ঝোলে, না হয় সেই ঝালে। কিন্তু তাই বলে তরকারির পুরোটাই শুধুই লঙ্কা? তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। তবে তা খাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো আমার এক বন্ধুর সাথে। মায় বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বটাই হয়েছে এই লঙ্কার-তরকারিকে কেন্দ্র করে!

বিকানির থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে। উদ্দেশ্য দিল্লী, আর সেখান থেকে উত্তর ভারত। ট্রেনে রাত্তির হবার বেশ আগেই ক্যাটারারদের একজন রাতের খাবারের অর্ডার নিতে এল। আমি যথারীতি এড়িয়ে গেলাম, খাবারের 'হাইজিন'কে প্রশ্ন করে। আমার উল্টোদিকে বসা একজন জিগ্যেস করলেন যে কি ব্যাপার, খাব কি? ওর সাথে পরিচয় হোল, জানলাম যে ও বিকানিরের ছেলে, দিল্লী আই.আই.টি তে পড়ে, ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে ফেরত যাচ্ছে। জানালাম যে আমার কি হাল! বেশ কয়েকবার নিজের দেশে এসে নিজের পছন্দের খাবার খেয়েই উল্টেছি, অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তাই মনে ভয়! একা একা ঘুরি, কোথাও উল্টে গেলে? তাই এদিক-ওদিক খাওয়া বাদ।

ও প্রস্তাব দিল যে আমি নির্ভয়ে ওর সাথে আনা খাবার খেতে পারি। খাবার স্বয়ং ওর মায়ের নিজের হাতের তৈরি, ওদের বিকানিরের বাড়িতে; তবে খাবারে যে মাছি বসেনি তার একশো ভাগ নিশ্চয়তা ও দিতে পারবে না! সাহস করে রাজী হয়ে গেলাম। বদলে ওর আবদার এই যে ওকে আমার পাসপোর্টটা একবার দেখতে দিতে হবে, ও একটু দেখতে চায় যে বিভিন্ন দেশের ভিসা-স্ট্যাম্পগুলো কেমন দেখতে হয়!

ও যে নিরামিষাশী তা আগেই জানিয়েছিল, তবে পোঁটলা থেকে ও যে খাওয়ার বার করলো তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। রুটিটা দেখে ঠিকঠাকই মনে হোল, তবে তা খেতে হবে যা দিয়ে তা দেখেই অবাক হয়ে গেলাম – এক খাবলা কাঁচা লঙ্কা, তবে তা রীতিমত রান্না করা! রান্নার সময় তাতে বোধহয় শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে নুন আর জিরের গুড়ো!

[19] শ্রী গৌতম সরকাবের ছেলেবেলাটা কলকাতায় কেটেছে। হায়ার সেকেন্ডারীর পর তিনি ছাত্র হিসাবে আমেরিকায় যান এবং পরে সেখানেই থিতু হন। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর স্বদেশ এবং প্রবাস-জীবনের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বেশ কিছু লেখা ওয়েলিংটন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'অঙ্কুর' এবং 'বৈশাখী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম যে এ কি বিড়াম্বনা, এতে মাছি না বসে থাকলেও এত লঙ্কা খেলে তো নির্ঘাত উল্টে যাব; আজ রাত্তিরে না হোক, কাল সকালে তো বটেই! দেখলাম যে ও দিব্যি চেটে-পুটে খাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম যে ওর ঝাল লাগে না? ও বলল যে খেয়েই দেখ না। সাহস করে একটু মুখে দিতেই আমার গলা-বুক একেবারে জ্বলে গেলো। আর খেতে পারলাম না।

আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট, ফেসবুকে কথা হয় মাঝে-সাঝেই। ওর থেকে আমি শিখি হিন্দি, আর ও আমার থেকে ইংরিজি। পরে একবার দিল্লী গিয়ে ওর সাথে দেখাও করে এসেছি, সাথে দিল্লী আই.আই.টির ক্যাম্পাসেও ঘুরেছি। আজ ওর সাথে ফেসবুকে কথা হবার পরেই ভাবলাম যে ঐ লঙ্কার তরকারি বানালে কেমন হয়? একটু রয়ে-সয়ে লঙ্কার বদলে ব্যাবহার করলাম ক্যাপ্সিকাম (বেল-পেপার), আর নুন-জিরের সাথে অন্য কিছু মশলাও। মন্দ হয়নি।

ফিরে দেখা

পূর্বা চ্যাটার্জী[20]

তোমাকে দেখেছি কতবার, কত সাজে
কখনো প্যারিসের ছোট্ট কফি শপে
তোমার উষ্ণতা পেয়েছি কফি কাপে
কখনো আবার দেখেছি তোমায় ইতালির কোনো অজানা গির্জাতে
তোমার ঘ্রাণ ছুঁয়ে গেছে আমার আমিকে
কখনো তোমার হাসি শুনেছি টাইম স্কোয়ারের বাতাসে
তোমার স্পর্শ ছুঁয়ে গেছে আমার অবয়বে
কখনো দেখেছি মেঘ বালিকার মতন ছড়িয়েছো নিজেকে
কখনো আবার ফুলের মতন ঝরে পড়েছো গাছের নিচে
কখনো তুমি নেমে এসেছো উচ্ছ্বাসিত গঙ্গার ধারা হয়ে
কখনো দেখেছি তোমায় শ্রাবন্তীর উপান্তে
তোমাকে কত বার দেখেছি কত রূপে
তোমার স্পর্শ, তোমার ঘ্রাণ, তোমার হাসি, তোমার স্নিগ্ধতা আজ কোনোটাই নেই
এখন শুধু হাহাকার, শুধু তোমাকে হারানোর বেদনা
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় আমাকে
সারি সারি শবের মাঝে হাতড়াই তোমার স্পর্শকে
এ কোন পৃথিবী? এখানে আজ গান নেই, প্রাণ নেই, কথা নেই
শুধু আছে তোমাকে হারানোর বেদনা
এই মৃত্যু মিছিল চাইনা আর, অবাসাদ অবক্ষয় বন্ধ হোক আজ
আবার ফিরে এসো তুমি আমার কাছে
আমাকে আমার সেই পুরোনো ভুলে ভরা ভাঙা-চোরা পৃথিবীটা ফিরিয়ে দাও

[20] পূর্বা চ্যাটার্জী একজন ওয়েলিংটনবাসিনী ডেটা অ্যানালিস্ট এবং গৃহবধূ। তিনি কবিতা লেখেন এবং ভাল আবৃত্তি করেন।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

করোনা

পারুল মুখার্জী[21]

চ গো চ সব জলকে চল,
আঁধার নামছে সাঁঝের বেলায়।
পা চালাইঞে জলকে চল, চাঁড়ে চাঁড়ে জলকে চল।
বলি হ্যাঁ গো দিদি!
এখনও ত শামীর মা আল্যো নাই...
কোনোদিন তো এত দেরি করে নাই?
তাইত দেখছি গো!
শরীরটা বুধহয় জুতের লাই।
না গো না,
হ্যাঁ দেখ শামীর মা কেমন ধড়ফড়াঁই আসছে ইদিক পানে,
বুধহয় কোনো খবর আছে।
খবর..... হ্যাঁ গো শুন, গ্যেছলাম দেঘরিয়্যা ঘর,
হুথায় যায়ে শুনি,
সারা দেশে নাকি 'করোনা' অ্যাসেছে,
বহুত লোক মৈরে যাছে,
সবাই ঘরে ঢুকে দুয়ারে হুড়কা দিছে!
'করোনা', সিটা কি লো?
বড় জন্তু বটে? ঢেঙগা পারা, না খাটো পারা?
না..... উটা একটা রোগ বটে।
সুড়ুৎ কৈরে শরীরটাতে ঢুকে ভিতরটাকে উথাল পাথাল কৈরে,
পরাণটাকে লিয়ে বেরান যায়।
বাপরে!! ইটা শুনে ত বড় ডর ল্যাগছে,
তাই গাঁয়ের মরদগুলা,
সারা দিন-রাত লাঠি হাতে পাহারা দিছে,
আর বলছে তুমরা সব দুয়ার বন্ধ করে ঘরে থাক, বেরাবে লাই।
যদি কেউ বেরায়, তাকে ল্যেতড়াঙই ঘরে ঢুকাঙই দিব।
ঘরের থেকে বেরাইঙছ
কি পরাণটা হারাইঙছ।

[21] কবি ও কবিতার পরিচিতি – শ্রীমতি পারুল মুখার্জী কলকাতাবাসিনী গৃহকর্ত্রী। গৃহকর্মের অবসরে গান, আবৃত্তি, কাব্য, সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিসরে তাঁর গমনাগমন। মানভূমের (পুরুলিয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের) কথ্য ভাষায় লেখা এই কবিতাটি।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

কান ধরে ওঠ-বোস

দিলীপ কুমার দাস[22]

ছোটবেলায় দেশে প্রাইমারী স্কুলে এবং হাইস্কুলেও পড়ার সময় দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় অমনোযোগী হ'লে, হোম-টাস্ক না করে এলে বা বদমায়েশী করলে তাদের শাস্তিদানের অনেকগুলি পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, এক পায়ে খাড়া হওয়া, নীল ডাউন, কানমলা খাওয়া, কান ধরে ওঠ-বোস করা, এমন কি চড়-চাপড় থেকে বেত্রাঘাত পর্যন্ত। তাছাড়া বিভিন্ন সম্ভাষণ-অপশব্দ, যেমন বাঁদর, মর্কট, শাখামৃগ, গাধা, গর্দভ ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার্থীকে অন্যদের সামনে হেয় করার পদ্ধতিও চালু ছিল। দেশে এখন অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে আমার জানা নেই। তবে নিউজিল্যান্ডে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক-মানসিক শাস্তিদান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তা করলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরী পর্যন্ত চলে যেতে পারে, টিচিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হতে পারে। এর পিছনে যুক্তি হ'ল একটা ছাত্র বা ছাত্রী লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়লে, অমনোযোগী হ'লে তার পিছনে সাধারণত পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, ঔপনিবেশিক ইত্যাদি একাধিক কারণ থাকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব হ'ল সেগুলি অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা বা করানো।

শুধু শিক্ষাঙ্গনে নয়, সামাজিক পরিসরেও কান ধরে ওঠ-বোস করানোর মধ্যে যেমন জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার একটা ব্যাপার আছে, তেমনি এর অন্য দিকটি হ'ল এর মাধ্যমে স্বকীয় দোষ বা অপরাধ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইদানিং দেশের খবরের কাগজে এরকম কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হ'ল মোটামুটি এই রকম –

ভারত এবং বাংলায় এখন গরীব মানুষের এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন অনুদান, যেমন গৃহনির্মাণ অনুদান, দুর্যোগ-ত্রাণ ইত্যাদি পাবার কথা। এগুলি পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানেই 'সর্ষের মধ্যে ভূত'। কিছু অসাধু কর্মকর্তার কারসাজিতে সেই অনুদানের একটা অংশ তাদের পকেটস্থ হয়। এর চলতি নাম হ'ল 'কাটমানি'। কাটমানি না দিলে বা দিতে না চাইলে আবেদন, অনুদান স্থাণুবৎ। এখন খবর হ'ল যে এরকম দু'চার জন কাটমানি খানেওয়ালাকে পাবলিক হাতে-নাতে পাকড়াও করেছে এবং তাদের কান ধরে ওঠ-বোস করিয়ে কাটমানি ফেরৎ দিতে বাধ্য করেছে। সেই খবর ছবিসহ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তা না হয় হ'ল। এতে করে যদি কাটমানি খাওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয় বা কমে তবে বুঝব কান ধরে ওঠ-বোস করানোর একটা উপযোগিতা আছে।

এই করোনাকালে কান ধরে ওঠ-বোস করানোর আর একটি প্রয়োগের খবর নজরে এল। তা হ'ল জনসমক্ষে মাস্ক ব্যবহার না করার জন্য বিধিভঙ্গকারীদের পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক কান ধরে ওঠ-বোস করানো। নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য। অনেকে আবার একে পুলিশের 'অতি-সক্রিয়তা' বলে সমালোচনা করেছেন।

মাস্ক না পরার জন্য পুলিশের কান ধরে ওঠ-বোস করানো।
প্রশ্ন উঠেছে, বিধি কার্যকর করতে কি 'অতি সক্রিয়' পুলিশ?

[22]লেখক ওয়েলিংটনবাসী এবং অঙ্কুরের সম্পাদক।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

এবার আর একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে লেখাটি শেষ করি। ওয়েলিংটনে দক্ষিণ ভারতীয়দের মন্দিরে দেখেছি ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত, স্ফীত-উপবীত-শোভিত, বাহু-বক্ষ-ললাট চন্দন-চর্চিত, দক্ষিণী রীতিতে ধুতি পরিহিত বয়স্ক ভক্ত (তিনি পুরোহিতও হতে পারেন) মুরুগানের মূর্তির সামনে মাতৃভাষায় অস্ফুটে কিছু বলে কান ধরে ওঠ-বোস করছেন। কান ধরার কায়দাটি সোজাসুজি নয়, কোণাকুণি। ডান হাত দিয়ে বাঁ কান ধরা এবং বাঁ হাত দিয়ে ডান কান। তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে মনে হল তিনি যেন বলছেন, "হে মুরুগান, ইহজীবনে জেনে বা না-জেনে অনেক দোষ পাপ করেছি। তার জন্য মাপ চাইছি। ক্ষমা-ঘেন্না করে এই অধমকে শ্রীচরণে ঠাঁই দিও।"

এক্ষেত্রে কান ধরে ওঠ-বোস হ'ল দোষ-স্বীকার এবং পাপ-স্খালনের মেড ইজি! জয় হো 'কান ধরে ওঠ বোস'!

****

'My Foster Puppies' - artwork by Maya Shaw – a Year 3 student in Wellington

প্রসেনজিৎ মজুমদারের[23] দু'টি কবিতা – 'কক্ষপথ' এবং 'বৃষ্টিবিষাদ কথকতা'

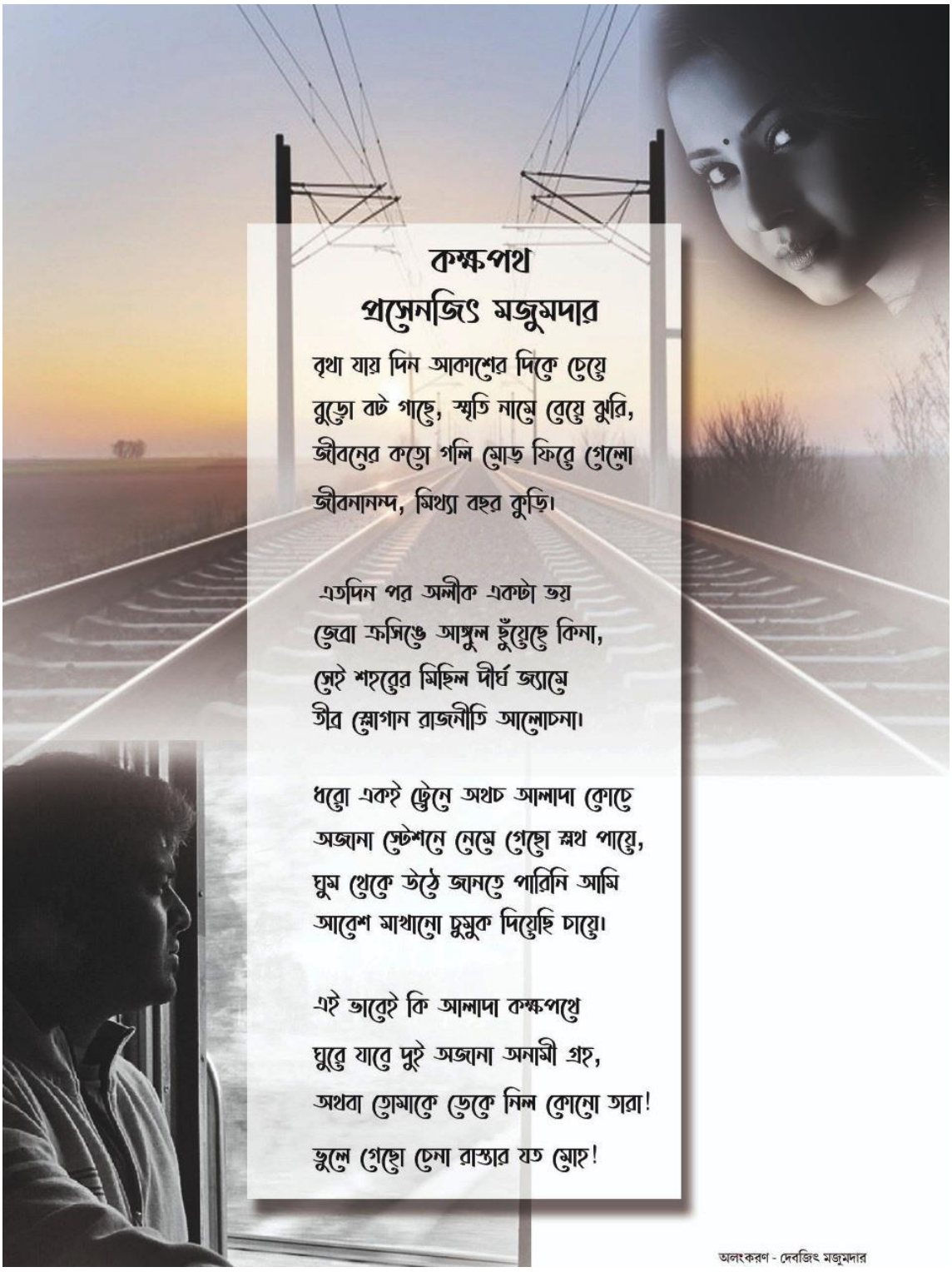

[23] প্রসেনজিৎ মজুমদার কর্মসূত্রে বর্তমানে বিলাসপুরী বাঙালী এবং ভারতীয় রেলের একজন আধিকারিক। তিনি কাব্য, সাহিত্যের চর্চা করেন এবং তাঁর লেখা আগেও 'অঙ্কুর'এ প্রকাশিত হয়েছে।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

বৃষ্টিবিষাদ কথকতা

প্রসেনজিৎ মজুমদার[24]

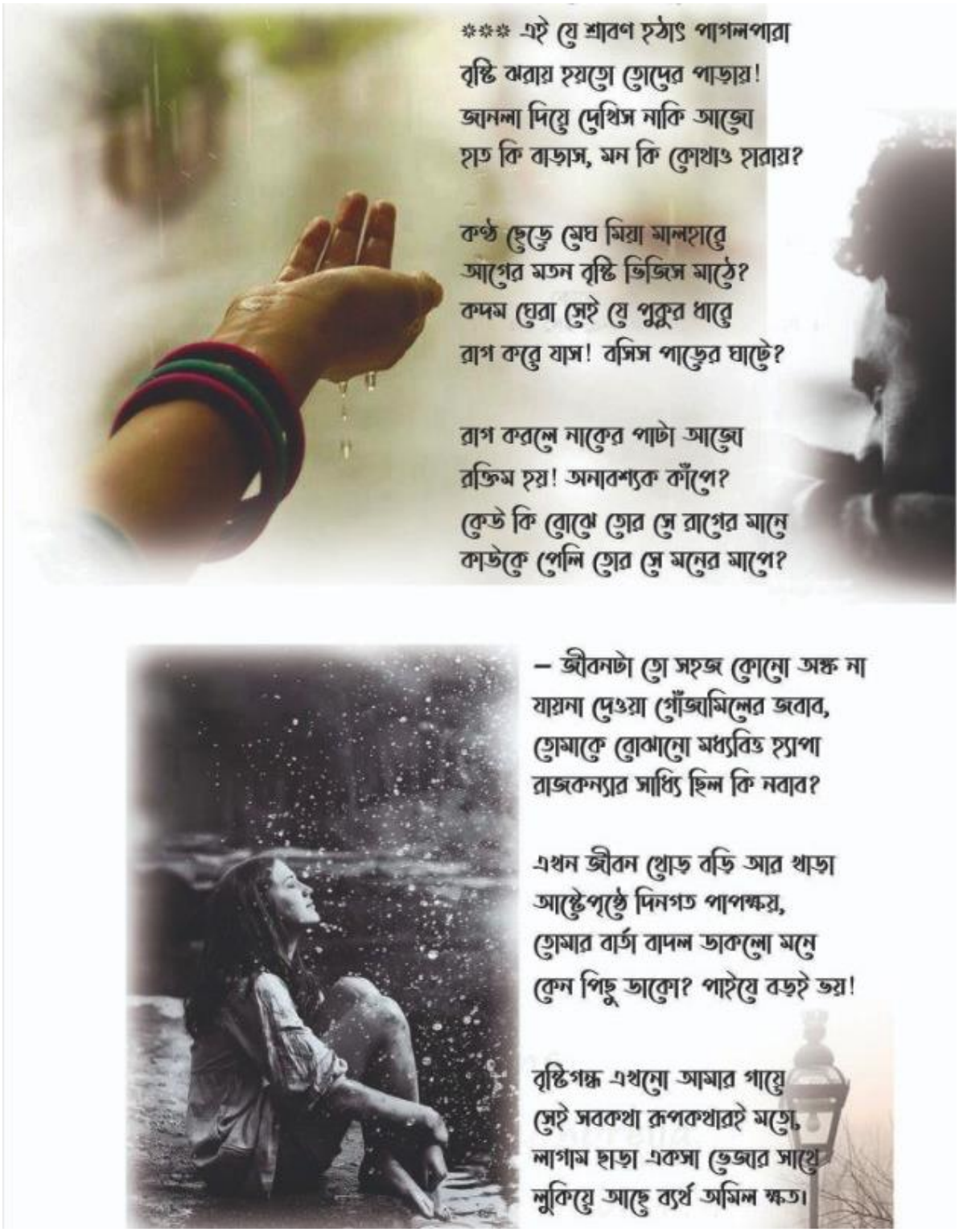

[24] কবি-পরিচিতির জন্য 'কক্ষপথ' কবিতার পাদটীকা দেখুন।

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

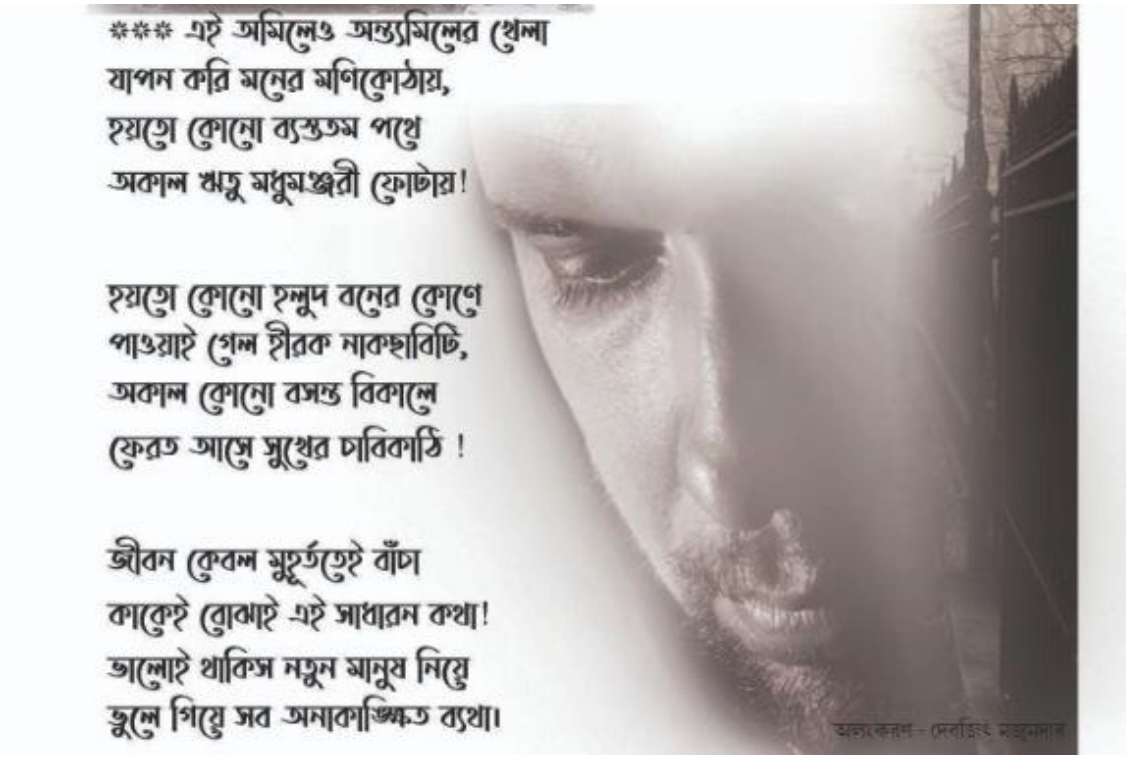

‘The Lion King’ by Adya Dutta, a year 10 Wellington student

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

অফিসের জীপ

অলোক চট্টোপাধ্যায়[25]

স্কুল পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হবার সময়ে যখন ভূতত্বে অনার্স নিলাম তখনই দিবাস্বপ্নে নিজের ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক ছবি চোখের সামনে ভাসতো। কল্পনার সেই 'আমি' পিঠে হ্যাভারস্যাক বেঁধে, পায়ে হান্টার জুতো পরে পাহাড়ে জঙ্গলে পাথরের খোঁজে ঘুরে বেড়াতো। সঙ্গে যন্ত্রপাতি বলতে একটা ম্যাপ, ব্রানটন কম্পাস আর একটা হাতুড়ি। 'আই অ্যাম দি মনার্ক অফ অল আই সার্ভে'। আর হ্যাঁ, সেই স্বপ্নের মধ্যে একটা জীপগাড়িও থাকতো। অকুস্থলের আশেপাশে পৌঁছে দেবার জন্যে। সত্যি বলতে কি জিওলজী পড়ার মুখ্য আকর্ষণের একটা কারণ ছিলো ঐটাও। খোলা জীপে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে একটা পা বাইরের ফুটরেস্টে রেখে জঙ্গলের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার মজাই আলাদা। কলেজ জীবনের ফিল্ডে যাবার এক আধ বার যখনই এরকম সুযোগ এসেছে, আমার মত লো প্রোফাইল ছেলেও ওই সীটের জন্যে প্রিয়তম বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে কখনো পেছপা হয়নি।

অদৃষ্টযোগে সেই স্বপ্নের চাকরিটা আমার জোটেনি। বরং বলা যায় সেই চাকরিটার জন্যে সমুচিত প্রচেষ্টা করার আগেই একটা জাতীয় গবেষণাগারে ঢোকার সুযোগ পেয়ে সেটাকেই আমার এতদিনের ভূতত্ব সাধনার চুড়ান্ত মোক্ষলাভ বলে ধরে নিয়েছিলাম। পরে যখন আমার জি এস আই বা ও এন জি সি তে কাজ করা বন্ধুদের কাছে তাদের ফিল্ডজীবনের রোমহর্ষক গল্পগাছা শুনতাম, তখন মনে একটু আধটু দুঃখ অনুভব করতাম ঠিকই, তবে ভেবে দেখলে ঘুরন্ত পাখার নিচে অথবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে টেবিল চেয়ারে বসে সাড়ে ন'টা – ছ'টা অফিস করার মধ্যে রোমাঞ্চ কম থাকলেও আরাম আর নিরাপত্তা অনেকটাই বেশী ছিল।

তবে হ্যাঁ, একটা হার্ডবডি জীপ আমদের অফিসেও ছিল। আর সেটাতে চড়ে দূরদূরান্তে আমাকে যেতেও হত কয়লা খনি থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজে। আমার পোস্টিং ছিল তখনকার মধ্যপ্রদেশ, অধুনা ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর শহরে। সেই যাত্রাগুলো সাধারণতঃ আমার রোমাঞ্চের সাধ মোটামুটি পূরণ করে দিত।

এমনিতে সেই গাড়িটা মাসের মধ্যে তিন-চার দিন ব্যাংক আর পাঁচ-ছ দিন বাজারে কেনাকাটার জন্যে শহরের ভেতরেই ঘোরাফেরা করতো। বিলাসপুর এমনিতে ছত্তিশগড়ের অন্যতম প্রধান শহর হলে কি হবে, তার যা সাইজ তাতে কলকাতার ভেতর ও রকম দশ-বারোটা বিলাসপুর আরামে হাত-পা ছড়িয়ে এপাশ ওপাশ ফিরে দিব্যি শুয়ে থাকতে পারে। ফলে মাসে জীপটার গড়পড়তা চলাফেরা হত মেরেকেটে তিন কি চারশো কিলোমিটার। বাকি সময়টা আরামেই কাটতো তার। ফলে, দু-তিন মাসে এক-আধবার ফিল্ড ভ্রমণে যাওয়া সেটার নৈমিত্তিক দিনচর্যার মধ্যে ছিল উটকো উপদ্রবের মত। আর তার দিক থেকে সে সাধ্যমত প্রতিবাদও জানাতে ছাড়তো না।

প্রসঙ্গত আমাদের ড্রাইভারদের কথাও বলে রাখা উচিত। দুজন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ড্রাইভার ছিলেন আমাদের অফিসে। এ কে ভার্মা আর কলিমুল্লা খান। সরকারী ড্রাইভারদের কোনো বিশেষ লক্ষণ তাদের ভেতর ছিলো না। দুজনেই ডিজেলের

[25] শ্রী অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায় খুব ছোটো বয়স থেকেই মূলত ছোটোদের জন্যে হাসির গল্প, ছড়া এবং বড়দের জন্যে কবিতা লিখতেন। কলেজে পড়ার সময়ে বাংলা শিশুসাহিত্যে মোটামুটি একটা জায়গাও করে নিতে পেরেছিলেন। তবে আটের দশকের শুরুতে চাকরিসূত্রে কলকাতার বাইরে চলে যাবার পর নানা কারণে তাঁর গল্প লেখার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু কবিতা লিখতেন বহির্বঙ্গের ছোটোখাটো পত্রপত্রিকায়। চাকরি জীবন শেষ করে বছর চারেক আগে কলকাতায় ফিরে আবার সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন প্রধানতঃ ছোটোদের গল্প, আধুনিক কবিতা এবং রম্যকাহিনী লিখে। তিনি পেশায় অবসরপ্রাপ্ত ভূতত্ব-বিজ্ঞানী। কর্মজীবনের নীরস শীলা পাথর নিংড়ানো অভিজ্ঞতার রস দিয়ে এখন লেখায় রসসঞ্চার করছেন। 'অঙ্কুর'এ এটি তাঁর প্রথম লেখা। তাঁর কর্মজীবনের কিছু পরিচয় বর্তমান রম্যকাহিনীটিতেই পাওয়া যাবে।

হিসেবে গোলমাল করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, মদ্যপান তাদের কাছে ছিলো প্রায় নরহত্যার তুল্য পাপ, আর গাড়ির সামনে অন্যমনস্ক পথচারী বা অসতর্ক গাড়ি এসে পড়লেও তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে যথোচিত অপশব্দের স্টক তাদের ভোকাবুলারিতে একেবারেই ছিলো না। সে পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তারা দুজনেই কক্ষোনো ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটারের বেশী গতিতে গাড়ি চালাতেন না। উপরন্তু ষাট সত্তর কিলোমিটার পার হলেই এক একবার দাঁড়াতে হতো গাড়িকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। (সেটা কিন্তু গাড়ির দোষ নয়, ওনাদের রিটায়ারমেন্টের পরে ঐ গাড়িকেই দৈনিক মজুরির ঠিকা ড্রাইভারদের হাতে সত্তর-আশীর গতিতে ছুটতে দেখেছি)। তা ছাড়া সন্ধ্যের পর তারা চালাতেন না, উলটো দিক থেকে আসা উঁচু বীমের আলোয় দেখতে অসুবিধে হতো বলে। ফলে উত্তরে পাঁচশো এবং দক্ষিণে সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরের সিংগ্রাউলি আর তালচের কোলফিল্ডে যেতে অন্তত দুদিন সময় লাগতোই।

আসল বিপদ অবশ্য ছিলো অন্যত্র। প্রতি যাত্রাতেই শহর ছাড়িয়ে কিছু দূর যাবার পরই গাড়িতে নানারকম খট-খটাং ঘট-ঘটাং শব্দ শুরু হত। সেগুলো ছিলো অতিরিক্ত কাজের ব্যাপারে তার নিজস্ব ভাষায় আপত্তি প্রকাশ। অভিজ্ঞ চালকেরা সেসব শুনে ভুরু কুঁচকে, মাথার চুল খামচে রায় দিতেন – এয়ার ফিলটারমে কাচড়া আ গিয়া কিংবা ডিফারেনশিয়ালমে গড়বড় হ্যায়। অতঃপর নিকটতম সারাইএর দোকানে গিয়ে তার সমুচিত ব্যবস্থা করা ছিল আবশ্যিক। আর জঙ্গলের পথে কাছেপিঠে দোকান না থাকলে ভগবান ভরসায় পরবর্তী জনপদের দিকে এগিয়ে যেতে হতো। সে এক টেনশন। আমার স্মৃতিতে এমন কোনো ট্যুর নেই যেখানে আমাকে ঐ গাড়ির কোনো ছোটবড় মেরামতির কাজ করাতে হয়নি। কি কারণে কোনো দূর যাত্রার আগে সেটা ঠিকঠাক করে সারিয়ে পাঠানো হতো না আমার কাছে সেটা ছিল রহস্যময়।

গাড়িটা খারাপও হতো সময় এবং স্থান বুঝে। সাধারনতঃ জনমানবশূন্য পাহাড় কিংবা জঙ্গলের রাস্তায় যার কাছেপিঠে কোনো লোকালয় নেই, বা লোকালয় থাকলেও গাড়ি সারানোর দোকান নেই, অথবা দোকান যদি বা থাকে তার মেকানিক ঠিক আধঘন্টা আগেই ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি চলে গেছে। সময় - মোটামুটি সন্ধ্যের ঝোঁকে। অবশ্য টায়ার পাংচার দিনের যে কোনো সময়েই হতো, তবে দশ বারের ভেতর আটবারে অন্তত সেসময়ে জোরালো বৃষ্টি হওয়া প্রায় নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। হেডলাইটের ফিউজ ওড়ার সময় অতি অবশ্যই অন্ধকার নামার পর। হর্ন খারাপ হবার জায়গা হয় পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ব্লাইন্ড টার্ন ওয়ালা ঘাঁটির পথে অথবা ছোটোখাটো বসতির ভিড় রাস্তায় তথা হাট-বাজারের মধ্যে।

প্রতিবারই ফিল্ড থেকে ফিরে গাড়ির গোলোযোগের বিশদ বিবরণ দিয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করতাম এই গাড়িটাকে ছুটি দিয়ে কম-সে-কম বাইরে যাবার সময়ে ট্রাভেল এজেন্সী থেকে ভালো গাড়ি ভাড়া করা হোক। আমাদের হেড অফিসে তাই করা হতো বলেই শুনেছিলাম। বলা বাহুল্য আমার কথায় কেউই কর্ণপাত করতেন না। বরং নিজেদের গাড়ি ছেড়ে ভাড়ার গাড়ি নিয়ে ফিল্ডে যাবার মধ্যে যে একটা নিদারুণ অসম্মানের ব্যাপার আছে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

পরে অবশ্য এক সিনিয়ার সহকর্মীর কাছে শুনেছি এর পেছনে একটা গুহ্য কারণও ছিলো। সে সময়ে আমাদের অফিসের বড়সাহেব, অর্থাৎ কিনা ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের খরচ করার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। খুবই সামান্য কিছু টাকার বেশি হলেই হেডঅফিসের অনুমতি নিতে হতো। সে অনুমতিও বড় সোজা ব্যাপার নয়। খরচের কারণ দেখাও, তার হিসেব কষো, তিন জায়গার থেকে কোটেশন আনো, তারপর সেগুলো পোষ্টে পাঠাও হেডঅফিসে। তখন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি ছিলো না। মাস খানেক বাদে খোঁজ করলে জানা যেত যে সে সব কাগজ পৌঁছোয়নি অথবা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন আবার পাঠাতে হতো, আর তারও মাস খানেকের পরে জানা যেতো কি কি ভুলভ্রান্তির কারণে সেই আর্জি নামঞ্জুর করা হলো। তখন আবার নতুন করে বানিয়ে আবার পাঠাও। গাড়ি মেরামতির মতো একটা সামান্য বিষয়ে কেউ ওসব ঝঞ্ঝাটে যেতেন না। তাছাড়া গাড়ি সারানোর একটা সরল উপায় ছিলো। তা হলো, তাকে ফিল্ডে পাঠিয়ে সারানো, কারণ শহরের বাইরে গাড়ি খারাপ হলে আপতকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ওপর মহলের অনুমতি ছাড়াই দরকারি খরচ করা আইনসিদ্ধ ছিলো।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে অফিসের সুবিধে থাকলেও যেহেতু ভূতাত্বিক হিসেবে প্রায় প্রত্যেক সময়েই আমাকেই বাইরের কাজে যেতে হত, আমার দুর্দশার অন্ত ছিলো না।

তবে, কতো কিছু শেখাও যেত ওরই মধ্যে। একবার রায়গড় যাবার পথে ঘোর জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে দাঁড়ানো হয়েছে গাড়িকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। সারথি কলিমুল্লা খান নিয়মমাফিক গাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখলেন। তারপর বনেট খুলে এটা ঘেঁটে সেটা নেড়ে ভয়ানক গম্ভীর মুখে জানালেন – 'রেডিয়েটারমে লিকেজ হ্যায়। পুরা পানি নিকাল গিয়া। ইস লিয়ে গাড়ি গর্ম হো গয়া।' সর্বনাশ, এখন উপায়? খান সাহেব তার সাদা দাড়ির ভেতর আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে জানালেন এক জ্যারিকেন ভর্তি জল নিয়ে রেডিয়েটারে ঢালতে ঢালতে যেতে হবে, যদ্দুর যাওয়া যায়। আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তখনো রায়গড় দূর্ অস্ত্।

এমতাবস্থায় চায়ের দোকানদার একটা আজব উপায় বাতলালো। হলুদবাটা দিলে নাকি লিকেজ বন্ধ হয়ে যায়। এমন আশ্চর্য্য দাওয়াই আমি তো কোন ছার, প্রবীণ কলিমুল্লা খানও কোনোদিন শোনেন নি। হলুদের অনেক ভেষজ গুণ আছে কবিরাজেরা বলে থাকেন, কিন্তু গাড়ি সারাইএর কাজেও যে হলুদের ব্যবহার হতে পারে এমন কথা আয়ুর্বেদের কোনো পুঁথিতে আছে বলে আমি এখনোও জানিনা। যাই হোক, অন্য উপায় না থাকায় সেই পদ্ধতিটাকেই পরীক্ষা করে দেখা হলো। অবশ্য হলুদবাটার অভাবে গুঁড়ো হলুদ অল্প জলে গুলে ছোটো ছোটো কয়েকটা মণ্ড পাকিয়ে ফেলা হলো রেডিয়েটারে। বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো – বাকি যাত্রায় এবং গন্তব্যে পৌঁছেও রেডিয়েটার থেকে আর এক ফোঁটা জলও পড়ে নি।

একবারতো বিশেষ রকম বাড়াবাড়িই হয়ে গেল। তখন আমাদের প্রবীণ দুই ড্রাইভারই রিটায়ার করেছেন। নতুন তথা কম বয়সী দিনমজুরীর ড্রাইভারে গাড়ি চালায়। তাতে গাড়ি আগের থেকে একটু জোরে চলে বটে, কিন্তু তারা গাড়ির হাল হকিকত সেরকম বোঝে না। গাড়ির নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের মর্মার্থ না বোঝার ফলে সেবার সিংগ্রাউলি যাবার পথে শাহডোলের কিছুটা আগেই আদিগন্ত ধানক্ষেতের মাঝে গাড়ির ক্লাচপ্লেট গেলো জ্বলে। অন্য গাড়ি থামিয়ে তাতে চড়ে শাহডোল গিয়ে মিস্ত্রী নিয়ে আসা, টো-চেন করে গাড়িকে টেনে সারাইএর দোকানে পৌঁছোনো, তারপর পাক্কা দেড়দিন বসে থেকে গাড়ি সারানো দেখা। আশা করেছিলাম ঐ ঘটনার পরে হয়তো কর্তৃপক্ষের একটু সহানুভূতির উদ্রেক হবে, কিন্তু কোথায় কি? পরের মাসেই ঐ গাড়ি নিয়ে আমায় তালচের ছুটতে হলো। আমি এরপর থেকে ও বিষয়ে অনুযোগ করা ছেড়েই দিলাম। ধরেই নিলাম ঐ ভাঙা জীপগাড়ি সারাতে সারাতেই আমার কর্মজীবনের বাকি দিনগুলো কেটে যাবে!

কিন্তু সেই যে কবি গেয়েছেন – 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।' আমারও দিন এলো।

এক দিন অফিসে ঢোকার সাথে সাথেই বড়সাহেব ভি এস সাক্সেনার জরুরী তলব। বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রের গত এক বছরের কয়লা অনুসন্ধানের তথ্যের ওপরে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। দুদিন বাদেই রাঁচিতে উচ্চস্তরীয় বৈঠক সরকারী কয়লা মন্ত্রক, কোল ইন্ডিয়া এবং কয়লার গুণ-মান নির্ধারণকারী আমাদের অফিসের প্রতিনিধিদের মধ্যে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। আমার কাজটাও সোজা নয়। দশ-বারোটা কোল ফিল্ডের কাজের বিবরণ তথ্য ও পরিসংখ্যান-সহ তৈরি করা। যা হোক সব ছেড়ে সেইটা নিয়েই পড়লাম। বিকেলের মধ্যেই রিপোর্ট তৈরি করে পৌঁছে গেলাম বড়সাহেবের চেম্বারে।

সেখানে তখন সাক্সেনা সাহেবের সঙ্গে দ্বিতীয় বরিষ্ঠতম অফিসার বিহারীলাল শা-ও অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বসে। দুজনেরই রাঁচি যাবার কথা। রিপোর্টটা খুব অবহেলার সঙ্গে একপাশে সরিয়ে রেখে শা-সাহেব জানালেন ওটার আর দরকার নেই।

এ আবার কি কথা? সারাদিন এতো খেটেখুটে রিপোর্ট বানানোর পর সেটা নিষ্প্রয়োজন শুনলে কার আর ভালো লাগে? তবে সে নিয়ে প্রশ্ন করার আগে তারা জানালেন তাঁদের রাঁচি যাওয়া হচ্ছেনা। কোনো ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। শা

সাহেব সারাদিন অনেক চেষ্টা করে এইমাত্র ফিরেছেন। অথচ খুবই জরুরী মীটিং, শাখা অফিস থেকে এ ধরণের বৈঠকে ডাক পাওয়াটাও বিশেষ সম্মানের। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়।

ঈশ্বর জানেন আমার মনে কোনো কুমতলব, কোনো রকম প্রতিশোধস্পৃহা ছিলো না। শুধু মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটাই বাক্য

- 'ট্রেনে জায়গা না পেলে অসুবিধে কি, গাড়িতে চলে যান।'
- 'গাড়িতে?'

শা-সাহেব প্রশ্ন হিসেবেই কথাটা ছুঁড়লেন বটে, তবে খেয়াল করলাম তার মধ্যে বিশেষ বিস্ময়ের অভিব্যক্তি নেই। অর্থাৎ কথাটা তাঁরাও ভেবেছেন।

- 'লেকিন কেয়া হামারা জীপ ইতনা লম্বা সফর কর পায়েগা?'
- 'কিঁউ নেহি?' আমার প্রতিপ্রশ্ন।

এ গাড়ি পাঁচশ কিলোমিটার দূর সিংগ্রাউলি যায়, সাড়ে চারশো দুরত্বের রাঁচি যাবার কিসের অসুবিধে? তাও আবার আদ্দেকের বেশী জাতীয় সড়ক। আর সত্যি বলতে কি তার আগের তিন-চারটে ট্যুরে গাড়িটা বিশেষ কোনো গোলমালও করেনি। সেটাও সুযোগমতো জানিয়ে দিলাম।

- 'রুট কেয়া হ্যায়? আউর রাস্তাকা হালত ক্যায়সা?' সাক্সেনা সাহেবের জিজ্ঞাসা।

জবাব আমার ঠোঁটস্থ। বিলাসপুর থেকে খারসিয়া, ধরমজয়গড় হয়ে পথলগাঁও। সেখান থেকে পূবমুখো জাতীয় সড়ক ধরে যশপুরনগর, গুমলা পেরিয়ে রাঁচি। সিধে রাস্তা, দশ-বারো ঘন্টার পথ। সকাল সকাল রওনা হলে সন্ধ্যের আগেই গন্তব্যে। উপরন্তু পাহাড়ের বুক চিরে যাওয়া সেই জঙ্গলাকীর্ণ পথের ভারি মনোরম একটা বর্ণনাও দিয়ে ফেললাম।

তারা উৎসাহিত হলেন। এদিক-সেদিক ফোন করে পথের ব্যাপারে আরো খোঁজখবরও নিলেন। তারপর মিটিংএর আগের দিন ঊষালগ্নে ভাড়ার ড্রাইভার-চালিত অফিসের জীপ নিয়ে তারা দুজন রওনা হয়ে গেলেন। আমি রুটিন ভেঙে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে হাত নেড়ে তাদের শুভযাত্রা জানিয়ে দিলাম। কথা হলো, রাঁচি পৌঁছে তাঁরা ফোন করবেন, আমি ততক্ষণ অফিসের ফোনের সামনে বসে থাকবো।

রাত ন'টা পর্যন্ত ফোন না পেয়ে সত্যি বলতে কি আমার একটু একটু অনুতাপ হতে লাগলো। দুজনেই বয়স্ক এবং অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, আমার ওপর যথেষ্ট স্নেহশীল। তাঁদের কোনো বিপদ আপদ হলে তার অনেকটা দায়িত্ব আমারই হবে।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ রাঁচি থেকে আমাদের হেড অফিসের এক হোমরা-চোমরা সাহেবের ফোন এলো। যথেষ্ট বিরক্তভাবে জানতে চাইলেন বিলাসপুর অফিস থেকে তখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি কেন, ওদিকে বারোটা থেকে মিটিং। সবিনয়ে জানালাম ওনারা গতকালই সড়ক পথে রওনা হয়েছেন। সন্ধ্যের আগেই তো পৌঁছে যাবার কথা ছিলো। শুনে সাহেব আঁতকে উঠলেন - বাই রোড? অফিসের জীপ নিয়ে। কার বুদ্ধিতে এরকম অ্যাডভেঞ্চার করা হয়েছে সেটাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন বটে, তবে খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণে নিজের নামটা আমি আর তাঁকে জানাইনি।

সারাটা দিন মহা দুশ্চিন্তায় কাটলো। একটু রাতের দিকে উসকো-খুসকো বিপর্যস্ত চেহারা নিয়ে সাক্সেনা সাহেব ফিরলেন। আমি আর সাহস করে খোঁজখবর নিতে যাইনি। দু একজন যারা গিয়েছিলেন তাদের কাছে শুনলাম পথলগাঁওএর আগের থেকেই গাড়িতে অল্পবিস্তর গোলমাল শুরু হয়েছিল। নানা রকম বিচিত্র যান্ত্রিক শব্দের অর্থ অনভিজ্ঞ ড্রাইভার বুঝতে পারেনি। সমানে চালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বিকেল নাগাদ লোকালয়ের থেকে অনেকটা দূরে গাড়ি একেবারেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভার কিছুটা চেষ্টা করে শেষে উলটো দিক থেকে আসা একটা গাড়িতে চেপে পনেরো কিলোমিটার দুরের নিকটতম লোকালয় থেকে এক মেকানিক ধরে নিয়ে আসে। জানা যায় যে লীক করে ইঞ্জিন অয়েল নিঃশেষিত হয়ে গাড়ির ইঞ্জিন পুরোপুরি বসে গেছে। অতঃপর, আবার সেখানেই ফেরত গিয়ে অন্য গাড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে বেঁধে সেটাকে নিয়ে

আসা হয় সারাইএর দোকানে। তবে তার আগে রাত দশটা পর্যন্ত সেই ভল্লুক-সঙ্কুল, হস্তি-উপদ্রুত অরণ্যের মধ্যে দুই অসহায় অফিসারকে গাড়ির দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়েছে। রাতে সেই সারাই দোকানের পাশে একটা ধাবার খাটিয়ায় রাত কেটেছে। মিটিংএর কথা দুজনেই ভুলে গেছেন। পরদিন সকালে সাক্সেনা সাহেব লড়ঝড়ে সরকারী বাসে চেপে, দুবার বাস পালটে বিলাসপুরে ফিরেছেন। শা-সাহেব রয়ে গেছেন, একেবারে গাড়ি সারিয়ে ফিরবেন, ঠিকে ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছেড়ে আসাটা উচিত হবে না বলে।

শা-সাহেবও অবশ্য ফিরে এলেন আরও একদিন পরে। ঐ ছোট্টো জায়গায় গাড়ি ঠিক করা যায় নি। তাই তাকে ট্রাকে চড়িয়ে নিজে ট্রাক-ড্রাইভারের পাশের কাঠের পাটাতনে বসে আড়াইশো কিলোমিটার সফর করে ফিরলেন বিধ্বস্ত চেহারায়। গাড়িকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন একদম কোম্পানীর ওয়ার্কশপে। যদ্দূর মনে পড়ে প্রচুর খরচ হয়েছিল সেটা সারাতে।

আমার সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিল দুই সাহেবের জন্যে। আমারই প্ররোচনাতেই তাঁদের ঐ দুর্গতি। আমার ওপর দিয়ে স্যাকরার ঠুক্ ঠাক চালিয়ে গাড়িটা কামারের এক ঘা-টা মেরেছিল তাঁদের ওপর। ওনারা অবশ্য আমাকে ওই ঘটনার জন্য দায়ী করেননি। শুধু সুরসিক সাক্সেনা সাহেব অনেক দিন পরে একবার বলেছিলেন – 'ইয়ার, বদলা লেনে কা টাইম হামারা উমর ভি তো খ্যায়াল করনা থা।' আমি লজ্জায় প্রায় মাটিতে মিশে যাই আর কী!

আর একটা কথা না জানিয়ে এ লেখাটা শেষ করা যাবেনা –
জীপটা সারিয়ে আসবার পরে সেটাকে আর কখনও বাইরের ট্যুরে পাঠানো হয়নি। তারপর থেকেই দুরের যাত্রার জন্যে বরাবর ট্রাভেল এজেন্সী থেকে ঝকঝকে এস ইউ ভি গাড়ি এসেছে। অফিসের জীপে চড়ে আমাকে আর কেউ ফিল্ডে যেতে বলে নি।

অনেকটা এরকমই ছিলেন তিনি

Foodie

Aroop Takyar[26]

Bygone times, people travelled regularly between the two major cities Dilli and Kolkata, there were comparisons galore not least of which was, which city offered the better food? Culinary wise the best of India's cities, Awadhi, Bengali, English and Mughal influences abound

When the first lock down lifted, people on wage subsidy went out to the man. . . and ate chips. Bellingtonians (Bongs born/brought-up here) not too far behind, junk food advertising beaming down on their phones.

There is a good chance they'll fail the Eelish test. Fooled by the delectable curry, they'll poke, and they'll prod with their fingers at the next mouthful until they are certain there are no bones in it. But when they bite down - missed about ten. Frankly, introducing the younger Bellingtonians to traditional good food is reward itself.

Foodie vs foodie

The Kolkattans with their sweets can beat any cuisine. Take Soanpapdi, it is fibrous and soft; each mouthful ending with a pleasant nothingness an almost surreal feeling of was it even there? The Dilli counterpart, Patisa has the aerodynamic properties of The Beehive

So no, I am not going to compare sweets. Because there is no competition. Let's compare other Durga Puja favourites with possible North Indian counterparts.

The Big Biryani Battle

We are overly PC these days – hesitant to cause offence. An Aussie comic went even further, explaining in a recent act that being offended doesn't matter "because nothing happens."
If you are offended by something you've seen or heard, you don't get COVID as a result. You don't get anything. So why moan about it?
Having cleared that, we move on

I am an incorrigible purist, there is mutton biryani and then there are pilafs - all of them. The Persian unfussy mix of rice and meat, travelled to the subcontinent and then, we did very clever things with it. The aroma of the Basmati rice steamed with authentic Indian spices and chunky pieces of Ghosht is enough to get it tattooed on your arm.

[26] Aroop Takyar a Bengali-Panjabi Delhite, is intimately connected with Bengal, currently a resident in Wellington, NZ and a spectator of various social phenomena – globally. He reflects on somethings, sometimes and has a good sense of humour. Needless to say, he is a foodie (khadyarasik in Bengali)

Insaan pakta hai gum mein, Biriyani pakti hai dum mein. Dum: A slow-cooking method in which the khansama layers parboiled rice and raw(kuchchi) or cooked(pukki), marinated meat in a heavy-bottomed vessel, sealing it with dough and cooking it for hours over a low flame. Dum Pukht, ITC Maurya Sheraton - Diplomatic Enclave Dilli, does a good Awadhi. The old ball and chain's version has its richness and complexity coming in part, from its layers of spices. Both ground and whole, as well as spice mixes used in the cooking process. Then garnished with nuts and caramelized onions. You just can't be in a bad mood when you are eating biryani

The East India Company should have never incarcerated Wajid Ali Shah at Garden Reach. Illegitimates!! You simply cannot mess about with pure Mughlai experience. The version foisted on Calcuttans - low on essence, low on spice, low on meat-to-rice ratio is low in my esteem. Boiled potatoes and eggs just don't cut it. Had the yellow rice thingy in Aminia, New Market, once. Make that twice. First and last

Radhaballavi vs Channa Bhatura

The closest relative to Bhatura in Bengal is the offering made to Lord Krishna in their temples by the Zamindars, Radhaballavi. It is a spicy-sweetbread and like its counterpart, is eaten for breakfast or a snack or a light meal or just like that

The spiced urad dal filling makes the Radhaballavi crisper. The Bhatura is puffier due to the yogurt in its dough, making it mildly salty, slightly fermented.

Bhatura's Channa masala is dry and spicy with a sour citrus note. A kind of Ghugni with attitude, sends your taste buds suddenly into warp drive. Channa Bhatura ensures that Punjabis don't have abs. So far, I haven't found a single person who actually knows what a Bhatura tastes like, except that it has a robust single-dimensional flavour

Radhaballavi's pairing with shada niramish aloo dom and misti channar dal defines the whole concept of eating by hand. No two bites are ever alike. Spicy, sweet, savoury, soft and al dente. Similar to Bhatura in the deep-fried department, but hugely evolved, to give you a crisp gastronomic experience. Alternate the two accompaniments or mix them. Apsaras tap dance on your tongue

In the Channa Bhatura nation of Dilli, there are seventeen capitals, the but the true embassy in Wellington is surely Bikaner in Petone. Here is the thing, Radhaballavi which can be only termed as WMD – Weapon of Mass Delectation is zealously guarded by the Bongs. They don't share it commercially

Puchka vs Gol Gappa

This clichéd comparison has been around ever since Bongs and Panjus learned to sneer at one another.

Well, they each have their own taste. The Puchka casing is flakier than the hard and crunchy one of the Gol Gappa. I must confess that I found the semolina Puchkas easier to handle once loaded, the Dilli version sometimes disintegrates in transit. The tamarind water in Puchkas is sour and spicy and is served at room temperature unlike the ice cold jal jeera pani served with the Gol Gappa. Most importantly, there is no ragda or bundi in the Puchka. Just chaat masala infused mashed potatoes with finely chopped green chillies. Here the Gol Gappa scores in the texture and multilayer taste department. Many puchka-wallahs in Kolkata offer *mishti jol*, an option not available to Dilliwallahs

It remains a male bastion, no ladies serving the snack. The lady setting them up on a plate for you to DIY at the local Desi doesn't count

In Kolkata, the favorite puchka haunts are around the New Empire cinema and outside the South City Mall, there are about twenty types. In Dilli arguably, the best Gol Gappas are available at – you won't believe this – Bengali Market, named after Lala Bengali Mal Lohia who built the place and had no connection with Bengal or Bengalis

Kolkata Kathi Rolls vs Seekh Kebab and Roomali roti

As a Hindu I believe in the theory of reincarnation that those who sin in this life are born as vegetarian in the next. Clearly a saint previously as I was able to indulge both these delicacies frequently and in reasonably quick succession. Which one is the better shayari on a plate? Impossible

Nizam's invented the kathi roll in 1932 to make the Kebabs portable to eat as some British babus were too fastidious to touch them - by wrapping them in **parathas,** just adding egg spread, sliced onion, finely chopped green chilies and a dash of lime juice and, these days, suspicious looking ketchup - robust multi-layered taste, the fore taste very different from the after taste. Gourmet street food, an oxymoron, but true. Glitter falls from the ceiling

Mohd. Aziz was a royal khansama in the kitchens of Bahadur Shah Zafar. His son Haji Karimuddin established Karim's in 1913 after the Delhi Durbar held to coronate George V. The spice mix, originally devised for the Mughal kitchens is used till today, a closely guarded secret

A whole chapter in Delhi's history missed by William Dalrymple. Theses succulent Seekh Kebabs are made with minced mutton, the condiments integrated into the meat along with raw papaya while mincing. Paired with the roomali, – a shortcut to heaven. Almost, too soft to lift,

impossible with a fork. Every bite is meant to cure the curse of vegetarianism. Never a better Seekh than Karim's, anywhere in India or abroad, was ever eaten

The Calcuttan makes you sing, the Dilliwallah makes you moan, neither is suitable for silly, thin women from Vogue who treat avocado and lettuce as food stuff. Funny though, both from Mughal kitchens but both evolved because of the British

Kosha Mangsho vs Butter Chicken

At birth Indians welcome the child into the family, by putting some honey in the child's mouth and whispering the name of God in its ear. In Bengal, I am sure, the next thing they whisper is Kosha Mangsho

Everybody knows that taste travels at the speed of light. Bah! What do scientists know! Things we think are delicious actually are only delicious because we taste them so fast so our taste receptors react quicker, unlike when you eat stupid celery. Also, this is why when you try to taste air, it tastes like nothing

Each one of my encounters was a kaleidoscope of overindulgence. The Kosha Mangsho's dark thick domination of gravy may lead to thoughts of clogged arteries. Don't worry, it won't happen. Rather, its meat Nirvana at first bite

It is the goat meat marinated overnight which gives it its zing, but I think the trick is in the mustard oil used. Best eaten with white Luchi

The Butter Chicken originated in 1948- out of left-over tandoori chicken. The three partners of Moti Mahal in Darya Ganj, Dilli had earlier introduced the culinary art of tandoori chicken in Peshawar. They fled at the time of partition and started the restaurant. The tandoori chicken was popular but to deal with left overs that would not survive the Dilli heat, they had to get a larger consumption. They made a creamy tomato curry with smooth satiny texture and cooked the tandoori chicken in it with lots of butter. And Butter Chicken was born. As a finishing touch there is a drizzle of honey, but it was no way intended to be as sweet as the New Zealand version. It doesn't have the high velocity taste of the Bong delicacy, rather tends to be a comfort food which allows you to wallow in it. Dream of either and you will dribble on to your pillow

It is impossible to tell this story without pissing off at least one, if not all the readers involved, but I do love food

Pujor Nomoshkar

New Zealand's COVID-19 Containment Strategy and Outcomes

Srikanta Chatterjee[27]
and
Nikhil Srivastava[28]

Background, Origin and Spread

Since the beginning of 2020, a new viral disease, which the World Health Organisation (WHO) has since named the Coronavirus disease-19 or COVID-19, has been raging around the world affecting many countries and causing loss of life and dislocating livelihoods. Different countries around the world have used different strategies to deal with the pandemic, with different outcomes. This article examines the experiences of New Zealand (NZ) in the containment of COVID-19, highlighting the policies NZ has used, how they evolved and with what effects. It starts however by discussing briefly the origin of the disease and its initial impacts. It goes on then to look at the sequential evolution of the strategy and the policies NZ adopted, their scientific rationale and their results. NZ's handling of the deadly contagion has come to be considered globally as being among the few successful ones, to date. The article investigates if NZ offers any lessons which other countries including India can make use of and also where NZ itself could have achieved better.

Reports on the website of the WHO indicate that, on 31 December 2019, the WHO's country office in the People's Republic of China (PRC) notes a media statement by the Municipal Health Commission of the city of Wuhan in the Hubei Province of China about the outbreak of 'viral pneumonia' of 'unknown cause' in the city. On the next day, the WHO sought from the Chinese authority further information on the reported cases. Two days later, the WHO received from them information on the cluster of cases of 'viral pneumonia of unknown cause' identified in Wuhan. On 7 January 2020, Chinese authorities identified and isolated a new type of coronavirus. Five days after that, China shared the genetic sequence of the virus for countries to use in developing diagnostic tools. Between 13 and 20 January, cases of the virus spread to other parts of China and also to several other Asian countries nearby. By 25 January, the number of reported cases worldwide rose to 5821, with 17 deaths. China imposes restrictions on the movement of people and the means of mass transport to and from Wuhan to prevent people travelling. On 4 February, the Director General of the WHO asked the United Nations (UN) Secretary-General to activate the UN crisis management policy to help deal with the anticipated spread of the contagion. Starting 5 February, the WHO has been holding daily media briefings on the disease, updating its relevant details and issuing advice and instructions for mitigating its impact. On 11 February, the WHO announced that the disease caused by the novel coronavirus would be named COVID-19. This helps to avoid, in WHO's words, "inaccuracy and stigma" which, references to a geographic location, an animal, an individual or a group of individuals might, potentially, have involved. On 11 March, the WHO made the assessment that the COVID-19 could be characterised as a pandemic. In announcing this, the Director General of the WHO stressed that "all countries can still change the course of this pandemic if they detect, test, treat, isolate, trace and mobilize their people in the response".

[27] Srikanta Chatterjee is an Emeritus Professor in the School of Economics and Finance, Massey University, New Zealand.

[28] Nikhil Srivastava is a doctoral candidate in the School of Economics and Finance, Massey University, New Zealand.

Countries did start to take notice, but not all act to deal with the disease at the same speed or with the same promptness, consistency and careful planning. And the virus soon engulfed effectively the whole world.

New Zealand, its Pandemic Strategy, Policy Sequencing and Outcomes

Moving on to NZ, let us first take a quick look at selected statistical indicators of NZ's economy, polity and geography. With its population of around 5 million and population-density under 19 persons per square km of its land area, as Table 1 reports, NZ must count as a small and sparsely populated country. Also, the country, made up of a number of islands, is geographically remote from the world's major population centres. This is helpful in controlling the movements of people, animals or cargo from the rest of the world.

Table 1. New Zealand: Selected Basic Statistics

Particular	Year	Total
Total Population (millions) (Male/Female)	2019	4.92 (2.42/2.49)
Life expectancy at birth (years) (Male/Female)	2018	81.9 (80.2/83.6)
Population density (people per sq. km of land area)	2018	18.39
Current health expenditure per capita, **PPP** (current international $)	2017	3,768
Current health expenditure (% of **GDP**)	2017	9.17
Mortality rate ages 5-14 years per 1000 live births	2018	5.7
Death rate, crude (per 1,000 people)	2018	7
Mortality rate age under 5 years per1000 live births	2018	6
GNI per capita, **PPP** (current international $)	2019	42,710

***Notes. GDP**: **G**ross **D**omestic **P**roduct. It is the money value of all the goods and services produced in a country in a given period, usually a year. **PPP: P**urchasing **P**ower **P**arity. An artificial exchange rate which is used to convert monetary magnitudes measured in different currencies into a common comparable unit. **GNI: G**ross **N**ational **I**nco**me: GDP** plus or minus the net overseas income of a country*.

Its per capita income puts NZ in the category of a high-income country. Its life expectancy at birth, crude death rate and the other health statistics, reported in the Table 1, indicate that New Zealanders, on average, live a long and relatively healthy life. NZ has in place a publicly funded universal healthcare system allowing unfettered access to healthcare, albeit sometimes with a degree of rationing necessitated by the numbers seeking access. Provisions exist for private healthcare too, but its scope is relatively small.

These health statistics are merely a selection of factual information. They are not meant to suggest that the NZ healthcare system is perfect. Like all national healthcare systems, NZ's too has many burning issues to contend with.

NZ recorded its first coronavirus case on 28 February, but its efforts to contain the disease had started earlier than this date and have been proactive and generally well-coordinated. On 24 January, while stating that the risk of the disease was not high, the NZ Ministry of Health put together a team to monitor the developing situation and advise appropriate action. On the next day, Australia, NZ's closest neighbour, reported three cases of the disease. From 27 January, NZ public health officials began meeting passengers arriving at airports from China to monitor early symptoms of the virus. On 30 January, the NZ government brought back some 200 citizens from Wuhan.

An existing Pandemic Influenza Technical Advisory Group (PITAG) was activated to help improve preparedness for a possible pandemic.

On 3 February, entry restrictions were introduced on non-New Zealanders arriving from, or transiting through, China. Those entering the country must self-isolate for 14 days. Anyone arriving from offshore and feeling sick within a month was instructed to seek medical advice. Starting on 29 February, passengers arriving on direct flights from selected east Asian countries were met and checked for symptoms at NZ airports. By 8 March, several more cases of the disease, all traceable to overseas travel, were reported, indicating the absence of social transmission locally, so far. Even so, a number of planned outdoors gatherings were cancelled, including a scheduled national remembrance service to mark the first anniversary of the Christchurch mosque shooting which had caused the death of 51 people. Starting 16 March, with some minor exceptions, everyone arriving in NZ, including NZ citizens, were required to self-isolate for 14 days. Cruise ships were not allowed to dock in NZ ports until 30 June. The Prime Minister (PM) described these measures as being the "widest ranging and toughest border restrictions of any country in the world", in line with her government's decision to 'go early and go hard'. On 18 March, the government urged all New Zealanders travelling overseas to return home. From the next day, all indoor gatherings of more than 100 people were prohibited, with the exception of workplaces, schools, supermarkets or public transport.

A country-wide four-stage alert-level system was announced on 21 March to deal with the anticipated surge in the spread of the virus; level 1 being the mildest, and level 4 the stiffest. The alert level is set at 2, and people over 70 years old and those with vulnerable immune system were urged to stay at home. The alert level is raised to 3 on 23 March and all schools were ordered to close starting that day. It was also announced that the alert level will be raised to 4, two days later, bringing in a nationwide lockdown, with the exception of specified "essential services". Political parties in Parliament unanimously pass a nationwide state of emergency on March 25. On that date, NZ had only 205 Covid-19 cases and no deaths. At a later date, the PM revealed that expert advice received in late March had shown NZ to be on a trajectory similar to countries like Italy or Spain, raising the possibility of the case numbers climbing to 10,000 or more by late July, without the strict lockdown.

The gradual and well-publicised advance toward the total lockdown made people prepare better and accept it with greater ease. A team of scientists, epidemiologists and other medical professionals, with the Director-general of health at the helm, was harnessed to provide necessary help and medical advice to the government. The PM, accompanied by the Health Minister and the Director-General of Health, started attending press briefings to explain relevant issues and answer questions regularly. The PM also took to *Facebook Live*, to "check in with everyone" (in the "team of 5 million" New Zealanders), as the nation locked down.

On 29 March, the NZ police website launched a new online facility for people to report any violation of the rules as prescribed under alert level 4.

In mid-April, the PM and her ministers took a voluntary pay-cut of 20%, in solidarity with the population at large facing financial stringency. The leader of the opposition and the Chief Medical Officer followed suit, accepting a similar pay cut.

NZ records the first death from the disease on March 29 when a woman in her 70s, who had recently returned from Iran, died. All travels to and from Iran were banned. On 1 April, NZ has 61 new cases, while 82 people had recovered, 14 are in hospital, of whom 2 were in intensive care, but stable. On 2 April, NZ had its biggest single-day increase in case number, with 89 new cases, which brought the total to 797. On 5 April, the total number of cases reached 1039. From April 10, everyone arriving in NZ must undergo 14-day supervised quarantine. Growth in case numbers then started to decline and

the alert level dropped to 3 on April 27, after just over a month at level 4. On May 13, NZ moved down to alert level 2. On June 8, there were, again, no active cases within the country, and the PM announced the lowering of the alert level to 1. All restrictions apart from the border controls eased and people were permitted to go about life normally.

Some 'significant clusters' of cases, defined as situations consisting of at least ten cases which are not part of the same household but connected through transmission of the infection, were identified and controlled to avoid further transmission. All were eliminated by late July,

The relatively small number of locally acquired cases testifies to the success of the strict and early enforcement of social isolation. As Figure 1 records, a large proportion of the cases in NZ have been imported or import-related.

Figure 1. Sources of the COVID-19 Contagion: New Zealand (as at 15 August 2020)

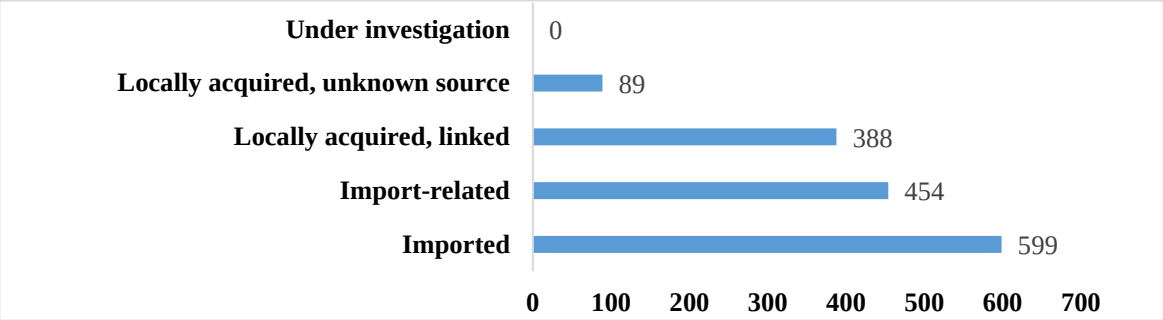

As Figure 2 shows, disease incidence in the 60+ age group, which works out at 19.4% of the total, was not very large, but when the number of deaths is considered, they are all in this group. This confirms the higher vulnerability of the elderly populations, providing justification for the restrictions advised for those in the 70+ age-group, even at alert level 2.

Figure 2 Age-wise Distribution and Impact of COVID -19 Contagion (as at 15 August 2020)

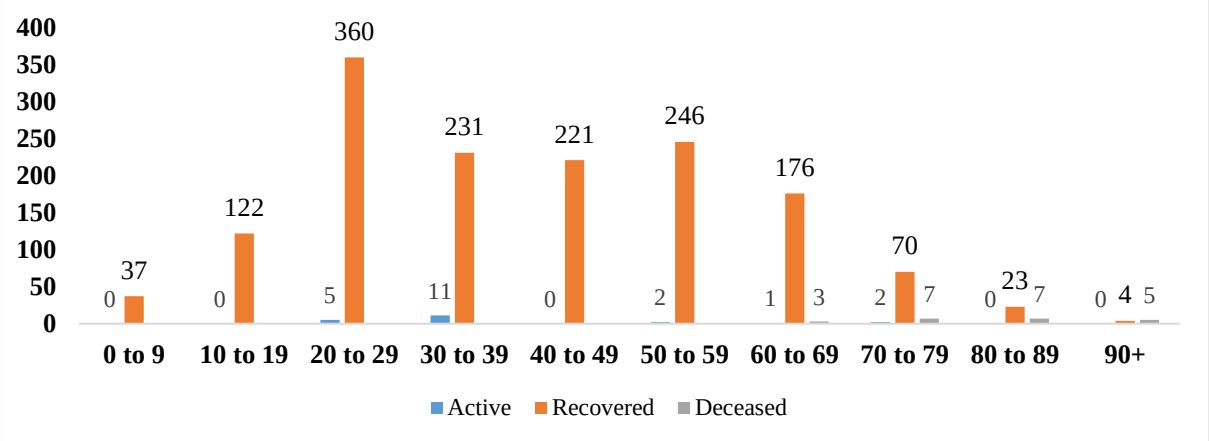

The aim of NZ's COVID-19 strategy has been not just to contain the virus but eliminate it through a consistent and sustained set of policies, informed by expert scientific advice and sound common sense. The major strands of that policy-setting, as outlined above, included border controls, monitoring the incidence of the disease, physical distancing of people and the observance of some sensible rules of personal hygiene, all clearly communicated to the general public regularly. Surveillance measures put

in place include the testing of people with respiratory symptoms and "sentinel testing" in the wider community with a particular emphasis on testing the potentially vulnerable populations even without symptoms of the disease. NZ's testing capacity of up to 8,000 per day is high in both absolute terms and per capita. The total testing done between 22 January and 1 August, at over 475,400, ranks among the highest in the world, per capita.

An important part of the strategy of minimising transmission of the virus is the capability to trace contacts of the infected cases and isolate them under supervision within four days of the exposure. NZ's COVID-19 mitigation plan has been actively pursuing these aims. The Ministry of Health has developed a technology to trace contacts and provide facilities for appropriate quarantining (Q) of actual or potential cases of infection. Facilities for "managed isolation" (MI) of New Zealanders returning home have been created and are being used at public expense. Total number of people who have been through MI and Q from 17 June to 14 August stands at around 19,000, with 98 confirmed cases and 29 active ones.

Despite these notable successes there have been several deficiencies in NZ's overall strategy. These include lapses in the residential elderly-care facilities where the casualties have been unduly high. These establishments evidently failed to test residents and staff adequately, train staff appropriately and/or provide personal protective equipment (PPE) on time. These deficiencies have come to put the entire system of elderly care under public scrutiny and calls are being made to examine the existing infrastructure of elderly care in NZ, identify its deficiencies and rectify them.

The number of breaches over the lockdown period from late March to mid-May had been over 2,000, of whom over 200 faced prosecution. Notably, the Minister of Health had breached the rules by driving his family to a nearby beach. The minister was publicly admonished by the PM but allowed to continue during the lockdown. Once the lockdown ended, the minister resigned.

In stage 1 of the lockdown, those entering the country are required to spend a specified length of time in facilities with supervised isolation, testing and quarantine arrangements. The management and supervision practices of these facilities have proved to be lax in some areas, resulting in the violation of border control and physical distancing protocols. A senior minister and a high-ranking official of the NZ Airforce have since been brought in to improve administrative discipline and provide expert advice and guidance

With the number of its confirmed and probable cases currently at 1643 - around 328 per million of the population and 22 deaths - NZ's record of containing COVID-19 is among the successful ones, globally. Its testing record on 47.8 cases out of 1000 is the fifth highest in the world.

The Economic Impact and the Response Package

While containing the contagion and saving lives has been the primary aim of the government's emergency policy package, the unavoidably adverse impact of the policies on people's livelihood needed also to be taken care of. With normal economic and social activities effectively suspended, individuals, families and businesses needed financial support and general help to sustain themselves through the lockdown and the period immediately beyond it. To that end, on 17 March, the government in coordination with the central bank put together an initial financial package worth NZ$12.1 billion, which is around 4% of its GDP, to cushion the immediate impact. It contained specific financial provisions for businesses and jobs, income support, support for health care and for some essential supply chains. A bigger financial package was passed in parliament later, with cross-party support, enabling the government to access NZ$52 billion for emergency spending. Several policies have been put in

place to alleviate uncertainties and financial hardships to home-owners and renters. An income support package to assist the most vulnerable in the population and a wage subsidy scheme to guarantee financial help to those thrown out of work because of the lockdown came to be activated. Employers too are being helped to retain employees through the period of the shutdown. Various other sector-specific assistance schemes have been developed to help individuals, families, businesses, social services and charitable organisations.

An Innovation Acceleration Fund of NZ$25 million was launched to provide "rapid short term support to NZ based entities to develop and more readily deploy a range of new products, processes and services" to help with the national COVID-19 containment strategy.

Side by side with these immediate relief measures, considerations for the period beyond have led to the setting up on 1 April of an Infrastructure Industry Reference Group tasked with identifying useful 'shovel-ready' infrastructure projects to be taken up in the post-COVID period. Local governments and various other groups have responded with proposals which can be undertaken promptly to create useful jobs in approved projects.

Once the emergency measures stop, further measures are bound to be needed to mitigate the anticipated hardships. Clear indications of these are yet to emerge.

NZ entered the lockdown in relatively sound economic health, with a low level of public debt, a steady and sustained, if modest, GDP growth, low and stable inflation, a strong financial system prudentially supervised by the central bank and served by financial institutions and practices which are transparent and generally efficient. These would no doubt help NZ withstand the financial pressures arising out of the relief measures which are funded by public debt. These debts will of course need to be serviced and, eventually, repaid, and will entail intergenerational consequences. These issues are well understood by policymakers and the informed public and are already being discussed and debated.

Inevitably, however, the economy will experience significant shrinkage and higher unemployment as a consequence of the lockdown and other restrictive measures. NZ exports of primary products, including high-quality food, are likely to enjoy strong overseas demand once the global economy begins to recover. But, some of NZ's major service sector exports such as tourism and international education, for example, are likely to face significant and, possibly, prolonged decline. These will, no doubt, have severe adverse consequences for economic growth and employment. A major aim of the relief package has been to inject purchasing power into the economy so that the harm caused by the forced closure of normal activities and the resulting decline in household and business spending is compensated for and the hardship to people's daily lives mitigated, at least to some extent.

To summarise: NZ's policies and practices in combating the contagion throws up several key elements, viz. uniting the nation; empathising with the citizens; relying on expert medical and epidemiological advice and input for policy-making; and communicating clearly and transparently with the public, with helpful advice and instructions. Countries as different as Norway and Sweden in northern Europe, Ethiopia in eastern Africa, China and Taiwan in East Asia and Australia and NZ in Oceania have all dealt with the contagion in their own ways, not always with total or prolonged lockdowns. They have achieved varying results. But their experiences offer some common elements, not dissimilar to those of NZ. Clearly, these elements are all informed by common sense and are therefore useful for policymakers everywhere, albeit with adaptations to suit each country's political and social culture and institutions.

Incidence of COVID-19 in India and Policy Response: In Search of Causes

India currently (at the end of August) ranks third in terms of the number of recorded cases, behind the USA and Brazil. Its number of daily infections has come to exceed the USA's. While the recovery rate has improved to 69% and the case fatality rate is still relatively low, the disease incidence has remained on a rising trend and probably not peaked yet.

So, where has the Indian response to contain the virus gone wrong?

To address this question, one needs to go beyond the issues around the current pandemic and look at some wider but related factual and institutional matters. The most important of these concerns the arrangements and the budgetary provisions India has in place for meeting the healthcare needs - and indeed a few other "basic needs"- of its citizens after seven decades of independence. While India's unique experiment in creating a democratic governmental structure and maintaining it over seven decades may be worthy of admiration, its failure to provide even the most basic civic amenities like health, sanitation, education, security and also human dignity must count among its serious deficiencies. India's total healthcare spending of 3.6% of GDP, and the public sector's share in it of a paltry 1.6%, shows up the stark reality that reliable healthcare has remained beyond the reach of the vast majority of the population. There is no dearth of medical expertise in India, but much of it operates in the private sector, while the public sector healthcare facilities, including hospitals, lack even the basic sanitation, hygiene and other infrastructure. It is ironic that, while India has emerged as a favourite medical tourism destination for wealthy foreigners, expert medical care remains beyond the reach of most Indians. Those who can afford it, source their own healthcare needs from the private sector and, even there, malpractices and highhandedness abound, as every Indian knows and dreads, but suffers in silence. It against this background that one has to understand why in India a pandemic like the COVID-19 becomes a catastrophe almost beyond control.

These shortcomings are exacerbated by the fact that politics in India has become increasingly divided and adversarial, both at the Centre and in the States, and often between the Centre and the States. This engenders mutual mistrust and stymies the building of political consensus necessary to unite the country generally and, especially, in times of national emergencies such as the current pandemic.

As I write this, on the 73rd anniversary day of India's independence, Jawaharlal Nehru's speech heralding India's political freedom comes to mind. On behalf of India's political leadership Nehru stressed the urgency for independent India to take steps to "fight poverty, ignorance and disease …. and create …. institutions which will ensure justice and fulness of life for every man and woman….".

It is a sad fact that these noble pledges have remained largely unfulfilled.

In a large and densely populated country of linguistic, religious, social and cultural diversity and widespread poverty, policy-setting needs particularly to be transparent and carefully targeted. And, for people to accept policies and offer compliance, a degree of trust in the government and the institutions is called for. Such trust is born out of the people's perception of the political leadership and their own daily experience of dealing with the public institutions such as the police, the judiciary, the medical establishment and the local, state or the central government agencies generally. It would be fair to say that such trust has increasingly thinned in India. To deal successfully with a national emergency, the primary consideration of a government must be to protect the lives and livelihoods of its citizens, in particular of the most vulnerable of them. The declaration of the COVID-19 related lockdown at four hours' notice which put the safety, security and the livelihoods of millions of the poorest Indians into chaos is one recent example of the distance between the ruler and the ruled in India. There is no evidence that the central government had held any dialogue with the other parties in parliament or with any of the state governments to seek to alert and unify the country in its response to the anticipated arrival of the virus.

The economic consequences and social disruption of this single act, which the Prime Minister later apologised for, are likely to prove more devastating and longer lasting than even the pandemic. Even before the onset of the pandemic, Indian economy had been slowing, level of employment actually declining over several years and the banking and financial sector, faced with several large defaults by prominent businesses with political connections, needing large capital injections to stay afloat. These problems will now prove even more difficult to address. Interestingly, much of the government's supposedly large pandemic relief package has been aimed at boosting the capital shortfall of the financial sector.

According to the latest reports, India's GDP estimate for the period April to June quarter 2020 shows a spectacular 23.9% decline compared to the same period in 2019; manufacturing having declined by39% and trade services by 47%. As economic activities continue to be far below normal, this decline is likely to continue, setting the Indian economy back significantly.

Political leaders and high-ranking officials in India have come to form a distinct class of their own, demanding and often receiving unquestioned public adulation and bestowing, in return, 'gifts' to the faithful, at public expense, and punishment to those who question them. Public accountability is not an important part of independent India's political culture, nor is the right to oppose or criticise considered necessary for a healthy democracy. Policymaking, as a consequence, is often arbitrary and ill-considered. Yet, it should not impossible for the elected representatives in the world's largest democracy to set aside their ideological differences and cooperate in the decision-making processes for the benefit of their constituents. India's bureaucratic establishment is made up of highly qualified and well-trained personnel. It is for the political leadership to take them into confidence in seeking to formulate policies.

To finish with a story about a PM of another established democracy which had just achieved some relief from its strict lockdown and people were starting to enjoy a more normal life: On a Saturday morning stroll, the PM of the country chances upon a café hosting its customers. Wishing to join them over a brunch, the PM approaches the café owner who recognises the PM but declines a seat because that would not fit in with the distancing rule still in force. The PM accepts it and walks on. Happily, however, the PM is called back soon enough as seats become available.

The PM and the country must remain nameless, but the apparently apocryphal story is not so. And the democratic culture reflected in the incident exemplary and inspiring.

Postscript

As I complete writing this article, NZ, after 102 days without any local transmission, experiences several new cases of COVID-19, all confined to one geographic area of the country. The process of tracing and isolating of cases started immediately. Testing of people with symptoms, already high, is ramped up and others without symptoms are tested at several places to minimise the spread of the virus. Alert level 3 has been introduced in the area affected and alert level 2 in the rest of the country. Starting with four new cases, the number has risen to 13 confirmed cases after seven days, and all but one of these cases are connected to the same source. How it all pans out remains to be seen.

COVID-19: A view from Wellington Regional Public Health

Margot McLean[29]

Since the beginning of the COVID-19 pandemic in early 2020, staff in public health services have been working hard to help protect New Zealanders from the spread of this new illness. The public may wonder: Where are these public health units, who works there, and what are they doing to stop the spread of COVID-19?

First, the facts. There are 12 Public Health Services in New Zealand. Staff are employed by District Health Boards (DHBs). The Wellington Regional Public Health service provides services to the Wairarapa, Hutt and Wellington regions. The public health services also have direct links with the Ministry of Health.

Public health service work is often work 'under the radar' to improve the health of the population and prevent illness. Health promoters work at a community level on many initiatives including advocating for better housing, supporting smoke-free initiatives and improving access to nutritious food and healthier environments. The communicable disease teams work to reduce the spread of many infectious (notifiable) diseases, for example tuberculosis, meningococcal disease, measles and many others. The school team support the health of school children and deliver immunisations, and the environmental health team works with councils and others on safe water, and improving our physical environment. The staff include specialist public health doctors and nurses, health promoters, health protection officers, analysts and managers.

The medical officers of health and the health protection officers are statutory officers. This means that they have legal powers under the Health Act and other laws, to protect the public's health. Some of these powers are quite restrictive of people's freedoms, for example ordering people to stay in a specific place while they are infectious. These powers are used only very occasionally, and with a lot of caution.

Since the first whisperings of a potential global pandemic in early January 2020, the public health units have been in full preparation and response mode. The first case in New Zealand was on 28 February, and was followed by ongoing cases in travellers returning from overseas. These travellers seeded local outbreaks, often before they realised that they were infectious. The challenge with COVID-19 is that the virus is so infectious and people can pass on the disease even before they have symptoms. This increases the number of people that need to be rapidly contacted, tested, and advised.

Public health staff have to work very fast to interview the people with COVID-19, give them support and advice, and track down all of the people who could have been in contact with them while they were infectious. This process is known as contact tracing and is bread-and-butter work for public health nurses, who do the same process around cases of many different diseases. Contact tracing aims to establish a potential source of infection, and to look for close contacts who had interaction with a case while they were considered infectious.

After we are notified of a COVID-19 case we start with a phone interview. Details we need to know are the history of illness, travel, any contact with a known case. This helps us understand

[29] Dr. Margot McLean is a Wellington based public health physician working through Regional Public Health Service in response to the current COVID-19 pandemic.

where they became infected. We then establish when the case would have been infectious and therefore could have shared the virus with others around them. This is the period of time we are most concerned with, and it is for this time we want to know all of their activities – where, when, with whom? Individuals who have had close contact with the case during this period are then followed up by us - provided with education about their exposure, the need to quarantine and then are followed up daily to review their health status. Other people who had less direct contact, for example who were in a supermarket at the same time, are considered 'casual contacts'. Casual contacts do not need to be quarantined but they need to be alert for signs and symptoms, and tested if necessary. Obviously, all the work we do is carried out with sensitivity and the individual's privacy as a priority.

It can be tricky for a person to recall what they did over the past days and weeks, especially if they are unwell. Sometimes it can take time and multiple phone calls to ensure we cover off all the potential places and people who may have been exposed. It's a pretty time consuming job. One case could have had many activities in the period of concern - parties, café visits, university lectures, gym classes, dinners with friends, flights, buses, taxis and so on.

Liz MacDonald, the public health nurse leader, says:
The contact tracing aspect of our work is really interesting. It sometimes feels like you're both public health nurse and private investigator as you work to track people down, and attempt to identify links between cases. Sometimes people choose to share some entertaining anecdotes with us and we find out what interesting lives people lead, even during their illness. We prefer people to over-share with us, in the pursuit of getting the most accurate information and again, the information people share with us is treated with sensitivity and the individual's right to privacy at front of mind.

Since the start of the Auckland outbreak in August, the Auckland Public Health unit has been extremely busy. Wellington and other public health services have been helping out with the contact tracing. A national database for cases and contacts has been developed this year by the Ministry of Health, so all public health services can see the same basic information. Once a case has been interviewed by the Auckland team, and contacts identified, the contacts are initially informed of the situation by a national team, and further daily follow up is undertaken by staff around the country.

Other COVID-19 activities during Wellington's current Level 2 includes working with the Managed Isolation Facilities, where people returning from overseas stay for two weeks. We work alongside the DHB staff, border staff, defence and the hotel staff to ensure that all precautions are taken and that any new cases of COVID-19 are managed thoroughly and safely. We also work with the port and maritime authorities to ensure safety at the sea border. Our health promoters work to provide information and support to our communities which are less likely to access 'mainstream' information.

This year has been challenging and rewarding for public health workers. It is important for us to always remember the 'be kind' mantra with each other at work, and while thinking about the people that we are working hard to support. Preventing COVID-19 is an all-of-society effort. The Maori whakatauki, or saying, is relevant to our work: *Nāu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi.* With your food basket and my food basket the people will thrive. This whakatauki talks to community, to collaboration and a strengths-based approach. This is how we approach public health work, understanding that everybody has something to offer, a piece of the puzzle, and by working together we can all thrive.

'দুর্গা-মুখ' এবং 'ঢাকী'
চিত্রায়ণে – চয়নিকা বোস (কলকাতা)

সূচীপত্রে ফেরার জন্য এখানে Click করুন।

স্থপতির কল্পনায় এবং পরিকল্পনায় অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের মডেল